প্রমথনাথ বসু
বাংলা রচনা সংকলন

সম্পাদনা

দীপককুমার দাঁ, সুবীরকুমার সেন

সহযোগিতায়

গৌতম মুখোপাধ্যায়



প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Published on 12 May 2000
প্রথম প্রকাশ ঃ ১২ই মে, ২০০০

প্রকাশক : সুভদ্রা দে (ঘোষ)
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : **অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস**
৮১, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচিপত্র

প্রমথনাথ বসুর জীবনপঞ্জি

১৮৫৫ — বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙা পৌরসভার গৈপুর গ্রামে জন্ম - ১২ মে (বাংলা - ৩০ বৈশাখ, ১২৬২, শনিবার)। পিতা - তারাপ্রসন্ন বসু, মাতা - শশীমুখী দেবী।

১৮৬১-৬৪ — প্রাথমিক শিক্ষা - খাঁটুরার মডেল স্কুলে (বঙ্গ বিদ্যালয়)। এই বিদ্যালয় প্রবর্তনের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম জড়িত আছে। কারণ সরকারের সহকারী ইনস্‌পেক্টার রূপে দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৫ সনের আগস্ট মাসে।

১৮৬৪ — কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট হাইস্কুলে ভর্তি - দাদু নবকৃষ্ণ বসুর (মোক্তার ছিলেন) তত্ত্বাবধানে।

১৮৭১-৭২ — এক বছর কম বয়সের জন্য এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। প্রকাশিত হয় কবিতা গ্রন্থ-'অবকাশ কুসুম' (২৭ পৃষ্ঠা)। Indian Mirror পত্রিকায় প্রশংসিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান পান-এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। পরীক্ষার ঠিক আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতিদিন পালকি চেপে গিয়ে 'সিক বেডে' বসে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

১৮৭৩ — কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ. এ. (First Arts) পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার। ২৫ টাকা মাসিক বৃত্তি অর্জন। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি।

১৮৭৪ — মে মাসে প্রকাশিত ফলে দেখা যায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা মিলিয়ে গিলক্রাইস্ট বৃত্তির পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছেন প্রমথনাথ। সেপ্টেম্বর মাসে ইংলন্ড রওনা। অক্টোবর - লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি ক্লাসে ভর্তি। বিষয় ছিল-রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন।

১৮৭৭ — পরীক্ষায় উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম এবং জীববিদ্যায় চতুর্থ স্থান লাভ।

ভারতের আয সভ্যতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে (Oriental Congress-ব প্রতিযোগিতায়) ইতালি সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত (আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনের রোম অধিবেশন)।

১৮৭৮ — বি. এস-সি'র শেষ পরীক্ষায় উদ্ভিদবিদ্যায় দ্বিতীয় এবং জীববিদ্যা ও প্রাকৃতিক ভূগোলে তৃতীয় স্থান লাভ।

বি. এস. সি পাশ করে 'এডোযার্ড ফর্বস্'—পদক ও পুরস্কার লাভ। বৃত্তির মেয়াদ না ফুরানোয় রয়াল স্কুল অব মাইনস্-এ ভর্তি।

১৮৭৯ — পরীক্ষায় প্রাণিবিদ্যা ও প্রত্নজীববিদ্যায় প্রথম স্থান। খ্যাতনামা অধ্যাপক টমাস হেনরি হাক্সলির ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন। শ্রেষ্ঠ ছাত্রের 'মারচিসন' পুরস্কাব লাভে বঞ্চিত হন এখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করায়। অক্টোবর - গিলক্রাইস্ট বৃত্তির মেয়াদ শেষ।

ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্যপদ লাভ।

ভাবত বিষয়ে বক্তৃতা, লেখালিখি এবং ছাত্র পড়িয়ে (ICS হতে আসা ভাবতীয়দের) অর্থ ডপার্জন। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা—ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ইংলন্ডে ভারত সচিবের কাছে চাকুরির আবেদন।

১৮৮০ — ইন্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদক পদ লাভ। ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধক কাজকর্মে জড়িত হয়ে পড়া। দাদাভাই নৌরজি, ডব্লিউ সি ব্যানার্জী, লালমোহন ঘোষ প্রমুখের সংস্পর্শে আসা। ইন্ডিয়া অফিসের বড়কর্তার (সাহেব) বিরাগভাজন হওয়া। ১৩ মে, লন্ডনে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসে কার্যে যোগদান।

সম্ভবত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম কোন আন্তর্জাতিক পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশ :

1. Undescribed Fossil Carnivora from Sivallic Hills in the Collection of the British Museum - *The Quarterly Journal of the Geological Society of London.* Feb., 1880.

2. Notes on the History and Comparative Anatomy of the Extinct Carnivora. *Geological Magazine,* Sept. 1880.

৩০ জুলাই ভারতে প্রত্যাবর্তন। ভারত গভর্নমেন্টের ভূতত্ত্ব বিভাগে অ্যাসিসট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে যোগদান। ছয় মাস দেশের নানা স্থানে খনিজ সন্ধান (শীতকালে), গ্রীষ্ম ও বর্ষাব ছয় মাস কলকাতার অফিসে বসে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও রিপোর্ট প্রস্তুত।

১৮৮২ — ২৪ জুলাই ঐতিহাসিক-সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার সঙ্গে বিবাহ। বিবাহ সভায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৮৮৪ — এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষের - ৩য় খণ্ড রচনা ('প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটির গত একশত বৎসরের গবেষণা' - ইংরেজিতে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার কাজ)।

প্রাকৃতিক ইতিহাস (Rudiments of Geology and Physical Geography) : বাংলায় বিজ্ঞানের বই রচনা।

১৮৮৪-৯৩ — ১৩টি গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশ। এগুলি - Records, GSI ও Memoirs, GSI-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মণ্ডলেশ্বর (নর্মদা) অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাত কেন্দ্রের সন্ধান।

১৮৮৬ — কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আন্দোলন শুরু। Technical & Scientific Education in Bengal পুস্তিকা প্রকাশ (অক্টোবর)।

১৮৮৭ — মধ্যপ্রদেশের ধূলি ও রাজহরাতে আকরিক লোহার খনি আবিষ্কার। (ভিলাই, রাউরকেল্লার লৌহ-ইস্পাত কারখানার কাঁচামাল এখান থেকেই আসে)। ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভায় ভূতত্ত্বের উচ্চ পর্যায়ের পাঠদান শুরু। কিন্তু চলেনি।

১৮৯১ — ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের (Indian Industrial Conference) ভিত্তি স্থাপন।

১৮৯৪-৯৬ — দু'বছরের ফার্লো ছুটি গ্রহণ। তিন খণ্ডে A History of Hindu Civilization during British Rule গ্রন্থ প্রকাশিত। এটি প্রমথনাথের জীবনের অন্যতম কীর্তি।

সাবানের কারখানা স্থাপন; আসানসোলে কয়লার খনি পরিচালনা, স্বদেশী শিল্প বিকাশের নানা উদ্যোগ শুরু।

১৯০১-০৩ — প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূবিদ্যার পাঠদান।

১৯০১-০৬ — ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভায় (Indian Association for the Cultivation of Science) ভূবিদ্যার পাঠদান।

১৯০৩ — চার্কুরিতে জুনিয়র টমাস হেনরি হল্যান্ডকে সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে নিয়োগের প্রতিবাদে ১৫ই নভেম্বর চাকুরি হতে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ (৪৮ বছর বয়সে) প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে। সর্ব মোট পেনসন ধার্য হয় ৪১৩ টাকা। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে যোগদান।

১৯০৪ — উড়িষ্যার গরুমহিষানীতে সমৃদ্ধ আকরিক লৌহের সন্ধান। ২৪ ফেব্রুয়ারি জে. এন. টাটাকে চিঠি লেখা —ঐ এলাকায় লৌহ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের আহ্বান।

Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education স্থাপন।

— বড় মেয়ে সুষমার বিয়ে ব্রাহ্ম মতে। পাত্র বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিস্টার প্রশান্তকুমার সেন (পাটনা নিবাসী)।

১৯০৫ — বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। স্বদেশী শিক্ষা গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ।

১৯০৬ — ১ জুন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (NCE) ও বঙ্গীয় কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ গঠনে সক্রিয় অংশগহণ। ২৫ জুলাই বেঙ্গল টেকনিক্যাল হনস্টিটিডট (BTI)-ব কাজ শুরু। প্রমথনাথ প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ (Principal)।

কলকাতায় শিল্প সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রমথনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯০৮-২০ — BTI-এর অবৈতনিক রেকটর। ১৯১০ সালের ২৫ মে উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের (NCE ও BTI) একত্রে সংযুক্তি।

১৯০৭ — কাশ্মীরে খনিজ সম্পদের সন্ধান। রাঁচিতে বসবাসের স্থায়ী গৃহ নির্মাণ।

দ্বিতীয় কন্যা সুরমার বিবাহ - পাত্র ব্যারিস্টার রজতনাথ রায়।

১৯০৮ — তৃতীয় মেয়ে প্রতিমার বিবাহ। পাত্র স্বনামধন্য ব্যারিস্টার স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র (ভারত সরকারের আইন উপদেষ্টা)।

২৭ ফেব্রুয়ারি - টাটার লোহার কারখানা TISCO-য় উৎপাদন শুরু।

১৯১১ — ত্রিপুরার মহারাজার আমন্ত্রণে খনিজ অনুসন্ধান। জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোকনাথ এখানেই ভূতত্ত্ববিদ রূপে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯১২ — ৭ এপ্রিল অশোকনাথ (২৮ বছর বয়স) ত্রিপুরায় জ্বরে পড়েন, কলকাতায় মারা যান।

১৯১৩ — Epochs of Civilization গ্রন্থ প্রকাশ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব।

১৯১৪ — চতুর্থ কন্যা পূর্ণিমার বিবাহ। পাত্র অমূল্যচন্দ্র বসু। টাটা কোম্পানির ফুয়েল ইনজিনীয়ার।

১৯১৬ — বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যশোহর অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি।

Illusions of New India গ্রন্থ প্রকাশ।

১ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) গোবরডাঙা পৌরসভায় কুশদহের সুসন্তান প্রমথনাথ বসুর নাগরিক সম্বর্দ্ধনা। মধ্যম পুত্র অলোকের বিবাহ।

১৯১৮ — মেজো ছেলে অলোকনাথের মৃত্যু (যুদ্ধ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে)। রাঁচিতে স্থানান্তরিত (আসানসোল থেকে) রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেন (আমৃত্যু)।

১৯২০ — আই. সি. এস. জ্ঞানাঙ্কুর দের সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা উমার বিবাহ।

১৯২১ — এপ্রিল, গোবরডাঙা কুশদহ সমিতির ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে (স্বগ্রামে) প্রমথনাথের যোগদান।

Survival of Hindu Civilization গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯২৩-৩৪ — ছোটনাগপুরের আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উন্নতিকল্পে সাধ্যমত অংশগ্রহণ।

১৯২৬-২৭ — প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রমথনাথ বসুর প্রতিকৃতি স্থাপন - অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক ।

১৯২৭ — Some Present Day Superstitions গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩০ — 'ভারত সাধনা শিক্ষা সম্মিলনে' — সভাপতি।

১৯৩২-৩৪ — অমৃতবাজার পত্রিকায় আত্মজীবনী—The Reminiscences and Reflections of a Septuagenarian ধারাবাহিকভাবে প্রতি রবিবার প্রকাশিত।

১৯৩২ — অক্টোবর। জামশেদপুরে বিরাট সম্বর্দ্ধনা।

১৯৩৪ — ২৭ এপ্রিল, ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ (সামান্য রোগভোগের পর)।

— ১৩ মে, রাঁচিতে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

— ২৭ মে, গোবরডাঙা পৌরসভায় শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৬ — ৮ মার্চ, গোবরডাঙায় P. N. Bose Memorial Town Hall-ব উদ্বোধন। উদ্বোধক মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়। ছোট ভাই অমিয়নাথ বসু এর প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে গোবরডাঙা পৌরসভার অধীনে পরিচালিত।

১৯৩৮ — ১৩ মে জামসেদপুরে তাঁর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন স্যার লিউইস ফেরমর, অধিকর্তা, জি এস আই, ভারত সরকার। রাঁচির বাড়ি-জমি বিক্রয়।

১৯৩৯ — সহধর্মিনী কমলা বসুর মৃত্যু।

১৯৪৬ — 'প্রমথনাথ মেমোরিয়াল সোসাইটির' প্রতিষ্ঠা। লেডি প্রতিমা মিত্র (কন্যা)-এর সভানেত্রী ছিলেন। প্রথমে ডাঃ অমরনাথ বসু (পুত্র) ও পরে ডঃ শিশির মিত্র এর সম্পাদক মনোনীত হন।

১৯৫১ — ১১ জানুয়ারি, জি এস আই-র শতবর্ষে পি. এন বোসের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন স্যার ডি. এন. ওয়াদিয়া, এফ আর. এস.।

২০০৫ — কলকাতার সল্টলেকে জি এস আই অডিটোরিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে প্রমথনাথ বসুর স্মৃতিতে।

প্রথম অধ্যায়

কেঁচো

১। **মুখবন্ধ**— কেঁচো সংস্কৃত 'কিঞ্চিলিক' বা 'কিঞ্চলুক' শব্দের অপভ্রংশ— যে কিং অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চলে। ইহার অপর নাম 'মহীলতা', এই তিনটির কোন একটি নাম দিলে অনেকের কাছে কেঁচো সম্ভবতঃ মান সম্ভ্রম পাইত। অন্ততঃ তত হেয় বলিয়া বোধ হইত না। 'কিঞ্চিলিক', 'কিঞ্চলুক', বা 'মহীলতা' অনেকের কানে শুনিতেও ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কানে চিরপরিচিত কেঁচো নামটাই ভাল শুনায়; অন্য কোন নামে ইহাকে ডাকিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে, লিখিতে কলম সরে না। পাঠক বলিতে পারেন, আমার রুচির দোষ। বলেন, বলুন! বাল্যকালাবধি যে নামটী শুনিয়া আসিয়াছি, ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার বড় প্রিয়, ছাড়িতে মায়া হয়। কেঁচোকে যে একটী বড় নাম দিয়া ডাকিলেই তাহার গৌরব বাস্তবিক বাড়িবে, আমার এরূপ বিশ্বাসও নয়। কার্য মহত্বই তাহার গৌরব। তাহার নামে কি করে?

আমরা মাছ ধরিবার জন্য কত কেঁচো খুঁড়িয়া তুলি। টুকরা টুকরা করিয়া বড়শিতে বিঁধি। কেঁচো মাছের উৎকৃষ্ট টোপ। গর্ব্বিত মানুষ মনে করে, "পরমেশ্বর আমাদের আহারের জন্য জলে মাছ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে ধরিবার জন্য ভূমিতে কেঁচো দিয়াছেন।" আহা কি অপূর্ব্ব কৌশল! মাছ ধরা ব্যতীত প্রকৃতির রাজ্যে কেঁচোর অন্য কোন কাজ আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান কে করে? তাহার প্রাণ আছে সেটুক বুঝিতে পারি, কারণ তাহাকে তুলিবার সময়, হিল্ বিল করিয়া নড়ে। কিন্তু কেঁচো নিকৃষ্ট প্রাণী; অনেকে তাহাকে ছুইতে ঘৃণা বোধ করেন; সে কি বড় কাজ করিতে পারে? তাহার বিষয় আমরা কি লিখিব ? তাহার ইতিহাস আমরা কি শিখিব?

কেঁচো প্রকৃতির কৃষক। যখন মনুষ্য জন্মে নাই, তখন জমি চষিয়া দিত; আর এখনও বন জঙ্গলে, যেখানে মানুষের লাঙল চলে না, সেখানকার জমি চষিয়া দেয়। কেবল তা নয় ; এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ কীট জমির একজন প্রধান সৃষ্টিকারক, এবং উর্ব্বরতা সাধক। আবার আমাদের যে অমিশ্র উপকার করে তা নয়, অনেক হানিও করিয়া থাকে। তাহার উৎপাতে বাড়ীর রক বসিয়া যাইতে দেখা যায় ও অগভীর ভিত্তি কমজোর হইয়া ফলে নিম্নগামী হয়; প্রাচীন, পতিত গৃহের মেজে তাহার পরিত্যক্ত মৃত্তিকাবৃত হয়। কেঁচোর এসব কাজ কিরূপে সাধিত হয় বুঝিবার আগে তাহার শরীরতত্ত্ব

অনুসন্ধান করা যাউক। তার জন্য যতটুকু সময় ও মনোযোগ দরকার, পাঠক তুমি তাহা দিতে কি কুণ্ঠিত? নিকৃষ্ট জীবের পর্য্যালোচনায় আমরা কত মহৎ সত্য শিখি। মানুষাদি উচ্চজীবকে বুঝিবাব একমাত্র উপায় নীচ জীবের আলোচনা করা। সংসারে ছোট বড় যত প্রাণী আছে সকলেই আমাদের আলোচ্য, বিজ্ঞানের চোখে সকলেই সমান। জীবের ক্রমোন্নতি প্রাণীবিদ্যার একটা দৃঢ় মূলীভূত সত্য।

২। **বাসস্থান**— কেঁচো ভিজে স্যাঁৎসেতে জায়গায় থাকিতে ভাল বাসে। বর্ষাকালে ইহাকে জমির অল্প নীচেই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার বিবর কখনও কখনও ২/৩ হাত গভীর হইয়া থাকে। বাসস্থান খুঁড়িবার সময় কেঁচো কতক মাটি ঠেলিয়া ফেলে, কতক উদরস্থ করে, এবং পায়ুদ্বারা মৃত্তিকা নির্গত হইতে থাকে। আমি একটি টবে মাটি পুরিয়া গুটীকত কেঁচো ছাড়িয়া দিলাম, ৩/৪ মিনিটের মধ্যেই তাহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ মাটি খুব চাপিয়া, শক্ত করিয়া একটীকে রাখিলাম; সে তাহা খুঁড়িতে একেবারেই যেন অক্ষম, মনে হইল, এদিক ওদিক নরম মাটি খুঁজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আর একটীকে তাহার সাহায্যার্থে দিলাম তখন দুইজনে গায় গায় জড়াইয়া একত্রে, একস্থানে মুখ বাড়াইয়া খুঁড়িতে লাগিল - একজন একটু, আর একজন আর একটু, এইরূপ একটু একটু করিয়া ঘণ্টার মধ্যে তাহারা অন্তর্হিত হইল। কেঁচোর বিবর সোজা নয়, বক্রাকৃতি; কখনও কখনও তাহার মুখ পাতা, ইট, পাটকেলের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে শত্রু না আসিতে পারে। তাহার বল্মীক পায়ু পরিত্যক্ত মল মাত্র। একজাতীয় কেঁচোর (যাহাকে ঘাসাচ্ছাদিত মাঠ ময়দানে সচরাচর পাওয়া যায়) বল্মীক স্তম্ভের ন্যায়। এই স্তম্ভ এক ইঞ্চ, দুই ইঞ্চ, বা ততোধিক উচ্চ হইতে পারে। আর এক জাতীয় কেঁচো আছে তাহার ঢিবি ছোট ছোট, পৃথক্ পৃথক্, গুটীর রাশিমাত্র। জলের মধ্যে কেঁচো অধিকক্ষণ বাঁচিতে পারে না। আমি কতকগুলিকে বিকালে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া, তার পরদিন সকালে দেখিলাম তাহারা মৃতবৎ; পরে ২/৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া গেল। তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার পর অনেক মরা কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। **খাদ্য; পাক - প্রণালী** —কেঁচো রাত্রিকালে আহারান্বেষণে বাহির হয়। দিনের বেলা অনেক শত্রু, পাখী, পিঁপড়া ইত্যাদি। অতএব তখন প্রায়ই লুকাইয়া থাকে। কেবল নিষেক (Fertilisation) কার্য্যের সময় মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কেঁচোর প্রধান খাদ্য মৃত্তিকা এবং পাতা। কিন্তু অন্যান্য বহুতর জিনিস খাইয়া থাকে, এমন কি চর্ব্বি, মাংস পর্য্যন্তও ছাড়ে না। খাইবার সময় মুখ এবং তাহার নিম্নস্থিত স্ফীত গলদেশ[১] (Pharynx) বাহির করে। কেঁচোর দাঁত নাই;

তাহার খাওয়া চিবান নয়, এক রকম চোষ্য। আমি উপরে যে টবের কথা বলিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি শুষ্ক পেয়ারার পাতা রাখিয়াছিলাম; তাহার শিরগুলি ছাড়িয়া ছাল চুসিয়া লইয়াছে এবং পাতা একটি জালের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত মাটি কিম্বা তাহার অন্ত্রাণি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার ভিতর অনেক অতি ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ড দৃষ্ট হইবে। এসব নিশ্চয়ই সে খাইয়াছিল। কিন্তু কি জন্য ? মাটি বা পাতাতে শরীর পুষ্টিকারক জীবজ পদার্থ (organic substance) বেশ আছে, কিন্তু ইটে নাই। তবে ইচ্ছা করিয়া এত ইটের টুকরা খাইয়া থাকে কেন?

এস্থলে কেঁচোর পাকযন্ত্র সম্বন্ধে, দুচার কথা বলা আবশ্যক। ইহার গঠন কৌশল অতি চমৎকার।

'গল' শব্দ গল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'গল্' ভোজন করা। যে রাস্তা দিয়া ভুক্তবস্তু মুখ হইতে জঠরে যায়, তাহার মুখের দিকের অংশকে গলদেশ বলা হইল। গলদেশের নিম্নে গল-নালী।

চিত্রে প্রথমতঃ মুখ, মুখের নীচে পূর্ব্বোল্লেখিত অত্যন্ত স্ফীত গলদেশ তার নীচে লম্বা গলনালী। গলনালীর নিম্নভাগ স্ফীত। এই স্ফীতাংশের আবরণ অত্যল্প স্থূল ও কঠিন, ইহাকে ইংরাজীতে ক্রপ বলে। ইহার নীচে জঠর, পরে অত্যন্ত লম্বা অন্ত্রাণি। ক্রপের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় সাতিশয় বলবান্ মাংসপেশী আছে। আহারের সময় এই সকল মাংসপেশী সজোরে চালিত হয়, এবং ক্রপের ভিতর ইষ্টক খণ্ড সমূহের সাহায্যে পত্রাদি খাদ্য চূর্ণীকৃত হয়। কেঁচোর দাঁত নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইটের টুকরা দাঁতের কাজ করে।



৪। **স্নায়ুপ্রণালী, ইন্দ্রিয়, মানসিক বৃত্তি ইত্যাদি** —কেঁচোর স্নায়ুপ্রণালী সূত্রের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে স্থূলাংশ, আমাদের মত পাকপ্রণালীর উপরিভাগে নয় নিম্নভাগে। কিন্তু ইহার সহিত সংযুক্ত গলদেশের উপর একটি বিশেষ স্থূলাংশ (Ganglion) দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর চোখ নাই। গাত্রদ্বারা আলোক প্রবিষ্ট হইয়া এই স্থূলাংশতে লাগে। তাহাতেই সে আলোক অন্ধকার বুঝিতে পারে, রাত্রি দিন চিনিতে পারে। দিনের বেলায় শত্রুর

১। ইহা দেখিবার জন্য একটা মোটাগোছের কেঁচো লইয়া তাহাকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা বা স্পিরিটে ডুবাইয়া মারিয়া ফেল। পরে তাহার পৃষ্ঠভাগে (যে ভাগ অপেক্ষাকৃত কম), মাঝামাঝি, মুখ হইতে গায়ের চর্ম্ম খুব ছোট ধারাল কাঁচির দ্বারা সর্তকতার সহিত ব্যবচ্ছেদ কর। পরে Pie dish এর ন্যায় পাত্রে জলের নীচে কর্কে বা কোন নরম কাষ্ঠখণ্ডে ব্যবচ্ছিন্ন চর্ম্ম দুই পাশে আলপিন্ দ্বারা বিদ্ধ কর। উপরে পাক প্রণালী। এবং তাহার নীচে শাদা সূতার ন্যায় স্নায়ু প্রণালী দেখিতে পাইবে। কর্ককে জলে ডুবাইবার জন্য তাহার নিম্নভাগে সিসা কি অন্য কোন ভারি পদার্থের পাতমারিতে, কিম্বা কর্কের নিম্নভাগ ও পার্শ্বচতুষ্টয় রাং দ্বারা মোড়াইতে হয়।

হস্ত হইতে রক্ষা পায়। যদি তাহার অগ্রভাগ ঢাকিয়া, কেবল পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত করা যায়, তাহা হইলে আলোকরশ্মি গলার উপরস্থিত স্নায়বাংশে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজে কাজেই সে অবস্থায় কেঁচোরও আলোকবোধ জন্মে না। তাহার কান নাই। ঢাক ঢোল বাজাও শুনিতে পাইবে না, নির্ভয়ে চরিবে। কিন্তু যে পাত্রে সে থাকে তাহা যদি কোন মতে স্বল্প পরিমাণেও চালিত হয়, তাহা হইলে ভয় পায়, এবং দ্রুতগতি বিবরে প্রবেশ করে। এস্থলেও শব্দ হিল্লোল, সম্ভবতঃ যে স্নায়ুর কথা এই মাত্র বলা হইল তাহা দ্বারা কাজ করে। কেঁচোর স্পর্শ শক্তি খুব প্রবল। বিবর হইতে বাহির হইবার সময় মুখ বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়া চারিদিকের খবর লয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে আমার টবস্থিত একটী কেঁচো বিবর খুঁড়িবার সময় শরীরের অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া কিরূপে নরম মাটি খুঁজিতে লাগিল। কেঁচোর আস্বাদনেন্দ্রিয় বেশ আছে, খাদ্যদ্রব্যের তারতম্যবোধ বিলক্ষণ প্রদর্শন করে। প্রাণীতত্ত্বানুসন্ধানী পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, সে কোন কোন গাছের পাতা খুব ভালবাসে, কোন কোন গাছের পাতা আদৌ স্পর্শ করে না। তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তত প্রবল নয়; চোনা, হুকার জল প্রভৃতি দুর্গন্ধময় পদার্থ তাহার বাসস্থানের উপর ঢালিয়া দিলে শুনিয়াছি সে বাহির হয়; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের গন্ধের দরুণ কি তন্মিশ্রিত হানিজনক পদার্থের দরুণ এরূপ ব্যবহার করে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কিরূপে দুইটী কেঁচো গায় গায় জড়াজড়ি করিয়া একত্রে কঠিন মাটি খুঁড়িয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। এই কাজে কি তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? পাঠক, তুমি হয়ত বলিবে, "কেঁচো আবার জন্তু, তার আবার বুদ্ধি! বাসস্থান নির্ম্মাণ করা, রাত্রিতে চরা, দিনে লুকাইয়া থাকা, এ সব অভ্যস্ত কাজ, ছোট বড় সব কেঁচোই করিয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধির দরকার নাই।" কিন্তু আমি যে স্থান হইতে উপরোক্ত কেঁচোদ্বয়কে লইয়াছিলাম, সেখানকার জমি খুব নরম; দুই জনে মিলিয়া যে শক্ত মাটি অপেক্ষাকৃত সহজে খনন করিতে পারিবে, তাহা তাহাদের অভ্যাস হইবার কোন সুবিধা ছিল না। তবু যে তাহারা একত্রে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা কতকটা বুদ্ধির পরিচয় নয় ত আর কি বলিব ? প্রাণীতত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত মৃত ডারডইন কেঁচো কেমন বুদ্ধি খাটাইয়া, যে পাতার যে দিক ধরিয়া লইয়া গেলে তাহার বিবরের মুখ উৎকৃষ্টরূপে বদ্ধ হইবে, ঠিক সেই দিক ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমরা যখন বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া কোন বিষয় ভাবি, তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হই। কেঁচোরও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে; সে যখন চরে বা অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে, তখন আলোক রশ্মি বা শব্দহিল্লোল তাহাকে তত উত্তেজিত করিতে পারে না। মন না থাকিলে মনোনিবেশ করা হয় না; অতএব কেঁচোরও মন আছে, এরূপ সাব্যস্ত করা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

কেঁচোর শরীর বহু সংখ্যক ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে। এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে দেখা যায় না। কিন্তু আঙ্গুল চালাইলে তাহাতে বাধে, খর্ খর্ করে। চলিবার সময় কেঁচোর পৃষ্ঠভাগে রক্তবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ, সঙ্কোচনশীল একটী লম্বা নল দেখা যায়। ইহার গঠন ও কার্য্য অত্যন্ত জটিল এখানে তাহার বর্ণনা করিব না। এই মাত্র বলিয়া রাখি, উহাতে রক্তের ন্যায় যে পদার্থ দৃষ্ট হয়, এবং কেঁচোকে কাটিলে যাহা নির্গত হয়, তাহা রক্ত নয়। যে জলীয় পদার্থ কেঁচোর বাস্তবিক রক্তের কাজ করে তাহা শাদা, রক্তের মত আদৌ দেখিতে নয়। কেঁচোর নিকট সম্বন্ধীয় জলবাসী অনেক কীটের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কণিকা আছে; তাহার শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ছিদ্র বহুল গাত্র দ্বারা সমাধা হয়।

কেঁচোর পুরুষ এবং নারী অঙ্গ দুই একত্রে প্রত্যেকে বিদ্যমান। কিন্তু তাহাদের পরস্পর সংযোগে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কেঁচোর দেহাভ্যন্তরাস্থিত পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায়; তাহাদের বিবাহ, ভিন্ন কেঁচোর নারী ও পুরুষের সহিত হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটী কেঁচো পরস্পর সম্মিলিত না হইলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না।

৫। **কৃষিকার্য্য** —কেঁচো আপন বাসস্থানের জন্য বিবর খুঁড়িয়া, মাটি উলটিয়া পালটিয়া দিয়া বৃষ্টি ধারার প্রবেশের ও চালনার সুবিধা করিয়া দেয়। যেখানে তাহারা অনেকে থাকে সেখানে এইরূপ শত শত বিবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিবরের দরুণ জমি নিঃসন্দেহ অনেকটা সিক্ত থাকে, এবং কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়। কেঁচো ইট পাট্‌কেলের ন্যায় বহুতর বীজ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ বীজ পরিত্যক্ত মলের সহিত বহির্গত হয়, তাহার উৎপাদিকা শক্তি কখনও কখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ বজায় থাকে, কালে উহা অঙ্কুরিত হয়।

কেঁচো জমি প্রস্তুত করিতে, এবং তাহাকে সারবান্ করিতে বড় পটু। কোন স্থানে ইটপাটকেল কাকরাদি ছড়াইয়া রাখিলে, সে নিম্নস্থ মাটি উঠাইয়া ক্রমশঃ উহাকে আবৃত করে। এই উত্তোলিত মৃত্তিকা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়; কালে ইহা দ্বারা উর্ব্বর শস্যোৎপাদক জমি তৈয়ার হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কেঁচো কিরূপে এবং কি জন্য জমির সহিত মিশ্রিত ছোট ছোট ইষ্টক খণ্ডাদি উদরস্থ করে। গাছপালার শিকড়ের নিকট হইতে এই সকল হানিজনক জিনিস এক একটী করিয়া বাহিরে সরাইয়া সে নিশ্চয়ই তাহাদের বৃদ্ধির বিশেষ আনুকূল্য করে। বিবরের মুখ বুজাইবার জন্য যে সকল পাতা জমির নীচে লইয়া যায় তাহা কালে পচিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়। আবার, পাতা কেঁচোর একটি প্রধান খাদ্য। উদরস্থ পাতার টুকরা সকল হইতে শরীরের পোষণোপযোগী পদার্থ গৃহীত হইলে, অবশিষ্টাংশ মলের সহিতনির্গত হয়, ক্রমে মাটির সহিত মিশিয়া যায়, এবং তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে।

একটী টবে একজন কেঁচোতত্ত্বানুসন্ধানী পণ্ডিত বালি পুরিয়া তাহাতে পাতা ও কতকগুলি কেঁচো রাখিয়াছিলেন, দিনকতকের মধ্যেই ঐ বালি উত্তম সারজমি হইয়া দাঁড়াইল।

৬। রক্ষাকার্য্য — ইটপাটকেলাদির ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিস কেঁচোর মাটিতে আবৃত হইতে পারে। এইরূপে বহুতর প্রাচীন পদার্থ যাহা এককালে জমির উপর পড়িয়াছিল, কেঁচোর দৌলতে জমির নীচে সুচারুরূপে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশিষ্ট অংশাদি তাহাদের নীচে হইতে মাটি তোলার জন্য জমিয়া যায়, এবং ঐ স্তূপীকৃত কীটোত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া সংরক্ষিত হয়। এজন্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের কাছে কেঁচো অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

৭। ক্ষয়কার্য্য — পৃথিবীর উপরিভাগ (ভূপৃষ্ঠ) বাতাস, বৃষ্টি, বরফ প্রভৃতির কার্য্যে বৎসরের পর বৎসর একটু একটু করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। কেঁচো এই ক্ষয়কার্য্যের সহায়তা করে। তাহার বিবর দ্বারা বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া কেবল যে জমির উপকার করে তাহা নয়, অপকারও করিয়া থাকে - জমি কমজোর হইয়া ধসিতে পারে; ধসিলে তাহাকে ধুইয়া লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। কেঁচোর ভক্ষিত মাটি, ইটপাটকেল, কঙ্করাদি অনেকটা তাহার বিবরের মুখে জমির উপর পরিত্যক্ত হয়। উহা, বিশেষতঃ বেলে জমির কীটের গুটির ন্যায় মল, বর্ষাকালে সহজে ধৌত হইয়া যায়, এবং বৃষ্টির জল মিশ্রিত পলির বৃদ্ধি সাধন করে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে, যে ঐ পলি নালা, খাল দ্বারা নদীতে বাহিত হয়।

(ভারতী, ৮ম বর্ষ, ১২৯১, কার্ত্তিক, পৃঃ ৩০৯ - ৩১৫)

ফুলের প্রতি

বাগানের ফুল! গোলাপ! বেল! তোমার হাসিতে তত আহ্লাদ হয় না। তাহাতে কেমন যেন কিসের অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। সে হাসি কাষ্ঠ হাসি; তাহাতে মধুরত্ব নাই, রস নাই। বাগানের ফুল! হাস তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নহে। আমরা তোমায় হাসাই জোর করিয়া — আমাদের সুখের জন্য। তোমার হাসি অতিশয় কৃত্রিম; তাই হৃদয় ভরা নহে; তাই তাহাতে আনন্দ পাই না। যে হাসিতে বাধ্য, তার হাসি কাহাকে উল্লসিত করে ? জন্ম যার কেবল আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তার প্রীতিকর কার্য্যে কে বিশেষ প্রীত হয় ? চিরভৃত্যের প্রভুচর্য্য কোন প্রভুকে হৃদয় ভরিয়া সুখ দেয়?

বাগানের ফুল! তুমি দাস, চিরদাস। তোমার জীবন মরণ আমাদের হাতে। মানুষ যদি তোমায় আজ ত্যাগ করে, কাল তোমার দশা কি হইবে ? শুকাইবে, মরিয়া যাইবে। যাহারা পরাধীন, চিরভৃত্য, পরের সাহায্য ব্যতীত অনন্যগতি, পরিণাম তাহাদের বুঝি এই প্রকারই হইয়া থাকে!

বাগানের ফুল! কাল নাই, অকাল নাই, সাজিয়া থাক বারমাস! তোমার অতুল সৌন্দর্য্যের ছটা দিক্ আলো করে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইবে কি, দুঃখ হয়। তোমায় আমরা সাজাইয়াছি তোমার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গের হানি করিয়া, — হানি কেন, প্রায় লোপ করিয়া। অই যে তোমার পাপ্ড়ির উপর পাপড়ি, তার উপর পাপ্ড়ি, কত দল পাপ্ড়ি শোভা পাইতেছে। ঐ শোভা কি তোমার বাঞ্ছনীয় ? উহা কি তুমি কামনা কর ? স্বাধীনতা থাকিলে কি উহা ধারণ করিতে ? না। তুমি ঐ পাপ্ড়ির বাহার পাইয়াছ কেশরের বিনিময়ে। কেশর পুষ্পের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, পুষ্পের পুষ্পত্ব। তাহা তুমি হারাইয়াছ যে সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত, সে সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই তোমার চক্ষের শুল। পাপ্ড়ির কাজ মুকুলে কেশরকে রক্ষা করা, বিকশিত কুসুমে, নিষেক ক্রিয়ার সহায়তা করা। যখন তোমার কেশর বিনষ্ট হইল, নিষেক ক্রিয়া বন্ধ হইল, তখন পাপ্ড়ির শোভা বৃদ্ধি তোমার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা, হৃদয়ভেদী বিদ্রুপ। স্বাধীনতা বিনিময়ে, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে কে বহুমূল্য, চাক্চিক্যশালী পরিচ্ছদের প্রার্থনা করে ? বেশভূষা যার জন্য, তাহাই যদি না থাকিল,তবে বেশভূষা নিঠুর উপহাস মাত্র।

সহরের ফুলে, বাগানের ফুলে, সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটে না। সে পিপাসা মিটে, কোথায়? অনন্ত সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হয়, কোথায়? বনে, প্রকৃতির রাজ্যে। বাগানের ফুল মানুষের। বনের ফুল প্রকৃতির। বাগানের ফুল সাজে মানুষের ইচ্ছায়, মানুষের সাধ্যে। বনের ফুল সাজে প্রকৃতির আজ্ঞায়, প্রকৃতির জন্য। তাই বনফুলের শোভা এত ভাল লাগে। তাই বন্যবৃক্ষ, বন্যলতা, বন্যফুল, বন্য যাহা কিছু সুন্দর তাহাই দেখিতে এত ভালবাসি। যে দৃশ্য পুরাতন হয় না। যত দেখিবে, ততই দেখিতে ইচ্ছা বাড়িবে।

বন্য গোলাপ! প্রকৃতির গোলাপ! বাগানের গোলাপের ন্যায়, মানুষের গোলাপের ন্যায়, দেখিতে তুমি তত সুন্দর নও, সত্য। তোমার একদল বই পাপড়ি নাই, তাও আবার ছোট ছোট। বাগানের গোলাপের কতদল পাপ্‌ড়ি — বড় বড় পাপ্‌ড়ি। কিন্তু বন্যগোলাপ! তুমি স্বাধীন। সকল প্রাণীই যাহার অধীন সেই প্রকৃতি ব্যতীত আর কাহারও অধীনতা মান না। তোমার হাসিতে কেমন যে একটু স্বাস্থ্যব্যঞ্জক লালিত্য, স্বাধীনতা-সুলভ মাধুর্য্য এবং মহত্ব আছে, তাহা অবক্তব্য। সে লালিত্য, সে মাধুর্য্য , সে মহত্ব, পরাধীনে, চিরদাসে, কারারুদ্ধে সম্ভবে না। বন্যফুল! তোমার সৌন্দর্য্য যে চক্ষুর ক্ষণিক প্রীতি উৎপাদনের জন্য, তাহা নহে। সে সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম আছে, উদ্দেশ্য আছে। তুমি নানা বর্ণে রঞ্জিত, চিত্রিত, বিচিত্রিত হও— হরিদ্রা, সাদা, নীল, লাল, বেগুনে, কত বর্ণের নাম করিব? মানুষের ভাষা হার মানে। বাগানের ফুলেরও ঐরূপ বিবিধ বর্ণ দেখিতে পাই। কিন্তু সে বর্ণের অর্থ নাই — কেবল নয়নরঞ্জক শোভা, কেবল বাহার! বনফুল! তোমার বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিশেষ অর্থ আছে, গভীর তত্ত্ব আছে, সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আছে। সে অর্থ বুঝিতে, সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে, সে ইতিহাসের কল্পনা করিতে কি সুখ হয়।

পলাশ! তোমার গাঢ় লাল ফুল বন আলো করিয়াছে। সৌখীন পতঙ্গাদি আকৃষ্ট হইতেছে; ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে; মধুপান করিতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিষেকক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে। পলাশ! তোমার শোভা সার্থক। কারণ তাহাতে ফল হয়; সেই ফলে বীজ জন্মে; সেই বীজে বংশবৃদ্ধি হয়। বাগানের ফুলের শোভা নিরর্থক, নিষ্ফল। সে ফুলের ফল হয় না, তার কি দুঃখ, তার ফোটাই বৃথা, তার জীবনে ধিক্!

বন-মল্লিকে! তোমার একদল বই পাপ্‌ড়ি নাই। বেল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র; তার কতদল পাপ্‌ড়ি। সৌরভেও তুমি বেলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার সৌরভ, সার্থক। কারণ, তোমার কেশর আছে, নিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

বনফুল? কত বিপদ আপদ অতিক্রম কর, বাধা প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া উঠ, নিজের বলে। বাগানের ফুলের তাহা করিতে হয় না, সে শক্তিও নাই। সার দিয়া, জল দিয়া,

কত যত্ন করিয়া, তাহাকে বড় করিতে এবং বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। তাই, সে এত দুর্বল; তাই একটু অযত্নেই তাহার আয়ুঃ শেষ হয়। বনফুল! তোমরা জীবন সংগ্রাম কি ভয়ানক ব্যাপার? বাগানেব ফুলের সে সংগ্রাম নাই, সে সংগ্রামজনিত শক্তি এবং বলও নাই, দুঃখ কষ্টে না পড়িলে, যন্ত্রণা ভোগ না করিলে, শত্রুর সহিত না যুঝিলে কি কাহারও বল হয়? বনফুল ? তোমাদের প্রত্যেকের কত শত্রু! তোমাদের প্রত্যেককে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাই, এত তেজ, এরূপ কান্তি, এমন স্ফূর্ত্তি।

সৌন্দর্য্যশালি, সুরভি বন-কুসুম! তোমার সৌভাগ্য। কত শত বনের মক্ষিকাদি তোমার কাছে পালে পালে আসিতেছে। তোমার অপর্য্যাপ্ত বীজোৎপাদনের উপায় করিতেছে। জীবন সমরে তোমার জয়ের আশা বাড়িতেছে।

কিন্তু, বীজোৎপাদন সংগ্রামের শেষ নহে। চারা জন্মিল, অন্যান্য ফুলের চারা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। এত বিঘ্ন সত্ত্বেও যে কতকগুলি সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, সে নিজের গুণে, নিজের বলে। এত ফাঁড়া কাটিয়া যে বাঁচিয়া উঠে, প্রকৃতির এরূপ কঠোর পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, তাহার বল, তেজ, না হইবে কেন?

(ভারতী, আষাঢ়, ১২৯২, পৃষ্ঠা - ১৪৫)

'অবকাশ কুসুম' — কাব্যগ্রন্থ (২৭ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। প্রমথনাথের বয়স তখন ১৬। এই বইতে রয়েছে শৈব্যার বিলাপ, তপোবনে ও শ্মশানে, ইংল্যাণ্ড গমনের সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি, জীবন (Longfelellow বচিত Pslams of life এর অনুবাদ), বঙ্গ বিধবা, কুমুদিনীর সাহস।

শ্মশান চিত্রের একাংশ এরকম —

"ছড়াছড়ি শ্বেত অস্থি; কঙ্কাল নিকর,
অসম্পূর্ণ দগ্ধ বাঁশ; ভষ্ম বাশি বাশি;
শেষ এই দশা ভব-যাত্রী সবাকার
কি কুটীরবাসী কিবা প্রাসাদনিবাসী —
কি সুখ - সম্পদ - সুতা, কি শোক - বিবশা, —
শ্মশান সঙ্গমে শেষে সবার এ দশা!
সুমার্জিত-কান্তি-তেজঃ, অসিত বরণ,
পদ, মান সমভাবে মিশায় শমন!"

সূত্রঃ মনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত 'আচার্য প্রমথনাথ', পৃ-৬।

হিমালয়ে একটি নীহার - বাহুর পাশে

হিমালয়ে উঠিতে উঠিতে প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়! সমতল বঙ্গভূমির পরিবর্ত্তে, এখানে গভীর উপত্যকাময় পার্বত্য প্রদেশ। একদিকে, উপত্যকায় ছয় সাত হাজার ফুট নীচে কল্লোলিনী তর্জন গর্জন করিয়া ছুটিতেছে; অন্য দিকে ছয় সাত হাজার ফুট উচ্চ হইতে জল প্রপাত বা তুষারপাত হইতেছে। বঙ্গে যেমন গরম এখানে তেমন শীত। বঙ্গে যা আছে, এখানে তা নাই। এখানে যা আছে, বঙ্গে তা নাই। বঙ্গের মল্লিকা, মালতী, যুথী এখানে ফুটে না। এখানকার কুসুম সুন্দরীদিগের নাম বাঙ্গলা ভাষায় পাই না, ইংরাজি নামে ডাকিতে হয়। এখানকার ফল ফুল ইউরোপীয়—অথচ বঙ্গদেশ এখান হইতে প্রায় দেখা যায় বলা যাইতে পারে।

হিমালয়ের ভিতর উচ্চতার প্রভেদে, উদ্ভিদ্ সংস্থানের আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি গাছ দেখিয়া কত উচ্চে উঠিয়াছি আন্দাজ করা যায়। হিমালয়ের পদতলে শাল বন। দার্জিলিংয়ের নিকট ওক, চেসনট, প্রভৃতি বড় বড় গাছ। আরও উচ্চে রডোডেন্ড্রন, ফার প্রভৃতি দেখা যায়। তার চেয়ে উচুতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত সুগন্ধি রডোডেন্ড্রন প্রভৃতি গাছ। এখানে ঘাস এবং অতিশয় ক্ষুদ্র ২/৪ রকমের ফুল ব্যতীত আর কিছুই জন্মে না। ইহার উপর সব বরফ, সেখানে জীবনের লেশমাত্র নাই। যে যেখানকার যোগ্য তাহাকে সেইখানে দেখা যায়। অথবা যাহাকে যেখানে দেখা যায় সে সেখানকার উপযুক্ত না হইলে, সেখানে তিষ্ঠিতে পারিত না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য নির্ব্বাচনী শক্তির এখানে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ফারকে শালের স্থানে রোপণ কর মরিয়া যাইবে, শালকে ফারের স্থানে রোপণ কর মরিয়া যাইবে।

পাশে একটি নীহারবাহু বা বরফের নদী। বর্ষাকালে পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্র যেরূপ প্রশস্ত হয়, সেইরূপ প্রশস্ত একটি নদী মনে করিয়া লও। নদীর জলের পরিবর্ত্তে বরফ – পাথরের মত শক্ত বরফ মনে কর, তাহা হইলে এই বরফ নদী বা নীহার বাহু কি কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উহা ছোট বড় বিবিধ প্রস্তরখণ্ড বক্ষে করিয়া অতি মন্দগতি চলিতেছে – এত আস্তে যে দেখিলে উহা যে চলিতেছে তাহা বোধ হয় না। ঐ অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে যে তুষার পড়ে তাহা জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়, সেই বরফরাশি নদীর আকারে নিম্নস্থানে নামিয়া থাকে। নহিলে, বৎসরের পর বৎসর তুষার জমিয়া ঐ শৃঙ্গ যে কত

উচ্চ হইত বলা যায় না; এবং ঐ তুষার রাশি কোনই কাজ করিত না। প্রকৃতির রাজ্যে অপচয় নাই; জড়ই বল আর প্রাণীই বল কোন পদার্থ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুযার কণারও জীবন ব্যর্থ নয়। উহারা একত্র হইয়া আট, নয় হাজার ফুট উপর হইতে বরফ নদীর আকারে এখানে নামিয়াছে। বরফ নদী আর কিছুদূর নীচে গিয়া একটি বেগবতী স্রোতস্বতীকে জন্ম দিয়াছে।

কল্লোলিনী হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিতেছে। চারিদিক হইতে আরও কত ভগিনী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিল। সকলে মিলিয়া, একত্রে হইয়া, হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া, উচ্চতানে গান গাহিয়া চলিতেছে। গুঁড়ি পাথর ইত্যাদি সম্মুখে যা কিছু বাধা প্রতিবন্ধক পড়িতেছে, তাহা সগর্ব্বে ঠেলিয়া ফেলিতেছে, চূর্ণ করিতেছে। কি তেজ, কি বীর্য্য, কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ! দৃশ্য অতি মনোহর! জীবনের প্রারম্ভে এইরূপই হইয়া থাকে। নদি! আরও কিছুদূর যাও, বয়স একটু বাড়ুক, এত লাফালাফি এত তেজ রহিবে না, এত উচ্চে হাসিবে না, এত উচ্চে গাহিবে না। কিন্তু তখন তোমার আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সে মূর্ত্তিও কি সুন্দর। সে মূর্ত্তি, ধীর গভীর, প্রশান্ত। এখন তুমি উগ্রা করালিনী! তখন তুমি প্রেমময়ী লক্ষ্মী। তোমার এই উগ্রমূর্ত্তিও সৌন্দর্য্যশালী; কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে ভালবাসার উদ্রেক হয় না, বরং ভয় হয়। বয়োধিক্যের সহিত তোমার যে মূর্ত্তি তাহা দেখিলে কেমন যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, কারণ তখন তুমি পরোপকারে ব্রতী। এখন তোমার কাছে কোন জীব তিষ্ঠিতে পারে না। তখন, তুমি কত জীবকে ক্রোড়ে স্থান দিবে, লালনপালন করিবে, কত জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবে। এখন তুমি কেবল ধ্বংস করিতেছ, বড় বড় পাথরকে ছোট ছোট নুড়ি করিতেছ, ছোট ছোট পাথরকে মৃত্তিকা কণায় পরিণত করিতেছ। তখন তুমি কৃষকের ক্ষেত্রে পলি দিবে, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবে, কৃষিকার্যে সুসার করিবে। তখন কত লোকের জীবন তোমার উপর নির্ভর করিবে, তখন লোকের আবাসযোগ্য কত নূতন নূতন জমি প্রস্তুত করিবে। এখন তুমি পৃষ্ঠে যদি কোন বোঝা বহ ত তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য। তখন তুমি পৃষ্ঠে কত বোঝা বহিয়া বাণিজ্যের সহায়তা করিবে। এক কথায়, এখন তুমি নিতান্ত স্বার্থপর, তখন পরের হিতই তোমার ব্রত হইবে।

অসংখ্য জীবের অশেষ হিত করিয়া পরে তুমি অনন্ত সাগরে মিশিবে। তখন দৃশ্যতঃ তোমার জীবনের শেষ হইল বটে, নদীর নদীত্ব গেল বটে, কিন্তু তখনও বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইল না, মহাসমুদ্রে বিলীন হইলে মাত্র। মহাসমুদ্র তোমার জন্মদাতা। তিনি আপনার শরীর হইতে জলীয়বাষ্প হিমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ওই জলীয়বাষ্প উচ্চশৃঙ্গে তুষাররূপে সংহত হইয়াছে। তুষাররাশি এই বরফ নদীর আকারে রহিয়াছে। এই বরফ হইতে তোমার জন্ম। তোমার জীবনের শেষ হইলে জন্মদাতার ক্রোড়ে লুকাইলে।

নদি! তোমার জীবন আদর্শ জীবন, মানব জীবনের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তোমার জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যেরূপ স্বচক্ষে দেখিতে পাই, মানব জীবনের আদি অন্ত সেরূপ দেখিতে পাই না। মানবজীবনেরও কি বাস্তবিক ক্ষয় হয় না ? তোমার মত কোন অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায় ? ক্ষুদ্র মানবাত্মা অনন্তাত্মায় বিলীন হয়? তোমার জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যেরূপ আমরা দেখিতে পাই, সেইরূপ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ জীব কি মানব জীবনের আদি অন্ত দেখিতেছে?

কবিবর কালিদাস হিমালয়কে দেবতাত্মা বলিয়াছেন। দেবতার স্থান বটে। হিমালয়ের মত দৃশ্য বোধ হয় যেন আর কোথাও নাই। এখানকার দৃশ্য নানারূপ। কোথাও নিবিড়ারণ্য - বড় বড় বৃদ্ধ শৈবালাবৃত বৃক্ষ: তাহাকে প্রণয়িণী লতা জড়াইয়া রহিয়াছে, যেন তাহার সঙ্গে একাত্মা হইয়াছে, মৃত্যু হইলে একসঙ্গে মরিবে, তার আগে ছাড়িবে না। ছোট, বড়, সরু, মোটা, লম্বা, চৌড়া কতরকমের ফার্ণ শোভা পাইতেছে। কতরকমের ফুল হাসিতেছে। কতরকমের পাখী গাহিতেছে। কোথাও পাৎলা জঙ্গল: ছোট ছোট বাঁশ, তার অতি সরু সরু পাতা : রডোড্রেনড্রনের লাল ফুলে লালে লাল হইয়াছে। কোথাও সুগভীর উপত্যকা, যেন অতলস্পর্শ বলিয়া বোধ হয়, তাহার ভিতর রজতহারের ন্যায় একটি নদী। কোথায় বেগবতী স্রোতস্বতী ভীষণবেগে ছুটিতেছে। কোথাও তুষারাবৃত শুভ্রশির উচ্চশৃঙ্গে গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সূর্যোদয়ে, বা সূর্যাস্তে, বা চন্দ্রালোকে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্যের খেলা।

এখানকার নীহারবাহুর পাশের দৃশ্যও অতি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য এবং মহত্ব মিশ্রিত। এখানকার সকলই মহৎ। শত বজ্রধ্বনির শব্দে সহস্র সহস্র ফুট উচ্চ হইতে ভীষণবেগে তুষারপাত হইতেছে। তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সমূহ গগনভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। সেখান হইতে বিশাল নীহারবাহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড বক্ষে করিয়া নামিতেছে। অদূরে কল্লোলিনী ভীষণ বেগে, ভীষণ গর্জনে ছুটিতেছে। এখানকার সকলই মহৎ, ক্ষুদ্র কেবল একটি মানুষ যাহার স্থান এখানে নহে।

এ স্থান দেবতার স্থান। একবার যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল। এ স্থান স্বর্গ, সশরীরে স্বর্গে আসিলাম। অচিরে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। কে যেন বলিল, মানুষ, স্বর্গ কি উচ্চে, না সুন্দর দৃশ্যে? স্বর্গ যে ভূমণ্ডলব্যাপী। সশরীরে স্বর্গলাভ করা যায়, অন্ততঃ স্বর্গ লাভ করিতে চেষ্টা করা যায়, যেখানে সেখানে। স্বর্গ কোথায়? মনের ভিতর। সুন্দর, পবিত্র, মহৎ। কিন্তু কথায় বলে, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" যার মন দেবতুল্য হয় নাই, সে স্বর্গতুল্য স্থানে গেলেও দেবতা হয় না, যেমন তেমনি থাকে। যার মন দেবসদৃশ, সে নরকে গেলেও সেখানে স্বর্গ সুখভোগ করে। বাহ্যদৃশ্যের সহিত মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সত্য। এখানে যেরুপ সৌন্দর্য্যের, মহত্ত্বের ছড়াছড়ি, তাহাতে কার মন না অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য সুন্দর, মহৎ, দেববৎ হয় । কিন্তু

কতক্ষণের জন্য ? আবার যে সেই। কয়েকদিন উপরি উপরি দেখ, এমন যে সুন্দর দৃশ্য, যাহা দেখিয়া, অনুপম, অবর্ণনীয়, ইত্যাদি কত বিশেষণ মুখে আসিতেছে, তাহা যেন পুরাতন বোধ হইবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া যেন সৌন্দর্য হারাইবে। বাস্তবিক কি উহার সৌন্দর্য্য অনেকটা নূতনত্বে নয়? হিমালয়ের রডডেন্ড্রন এবং ফার - বন, সুগভীর উপত্যকা, বেগবতী কল্লোলিনী, তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহ ছাড়িয়া একবার সমতল বঙ্গে যাও। সেখানে, সন্ধ্যার পর একটি দীঘির পাশে, বড় বড় অশ্বত্থ গাছের ছায়া চন্দ্রালোকে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। অসংখ্য জোনাকিপোকা উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘুরিতেছে, - সে দৃশ্য কি মনোহর নয়? প্রথম, কি অনেক দিন পরে দেখিলে, সেখানেও মনে অনির্ব্বচনীয় সুখ হয় না? সেখানেও কি সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় না? যায় - সুখ মনে, স্বর্গ মনে। সুখের জন্য মানুষ লালায়িত, পাগল, চারিদিকে ছুটিতেছে। কেহ সুখ খুঁজিতেছে যশে, কেহ টাকায়, কেহ আরও কত কিসে। কিন্তু সুখ কোথায় ? আবার বলি মনে। ইহা পুরাতন কথা। কথাটা বলিলে পুরাতন বলিয়া কোথায় কতবার যেন শুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তবু ত মনে থাকে না। মনোজগতে এখন নুতন সত্য নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত শত বৎসর পূর্ব্বে, গৌতম, খ্রীষ্ট, প্রভৃতি মহাত্মারা যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, আজও সেই সকল সত্যই প্রচারিত হইতেছে। অনেক পুরাণ কথা আছে, যা হাজার বলিলেও পুরাণ হয় না।

স্বর্গের কথা বলিতে বলিতে সুখের কথা আসিয়া পড়িল। স্বর্গ এবং সুখ কি তবে একই জিনিস? তাহাতে সন্দেহ কি ? প্রকৃত সুখ, স্থায়ী সুখ, যে সুখ পৃথিবীর বিপদ আপদে, শোকতাপে, দুঃখ ক্লেশে হারাইবে না, তাহা স্বর্গলাভ না করিলে, দেবতুল্য না হইলে, পাওয়া যায় না। বাহ্যিক কিছুতেই সে সুখ বাড়াইতেও পারে না কমাইতেও পারে না। যে সুখ অন্বেষণ করে, সে স্বর্গলাভ করিতে চেষ্টা করুক। স্বর্গলাভ করাই তাহার স্বার্থ। যে বাস্তবিক স্বার্থ বুঝে, যে প্রকৃত স্বার্থপর, সে দেবতুল্য হইতে চেষ্টাটা করিবে - যাহাতে মন বিকৃত হইতে পারে, যাহাতে পরিতাপ হইতে পারে, সেরূপ কাজ, সেরূপ চিন্তা হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা করিবে।

যাহা আছে তাহার মূল্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না, অনেক সময়ে তাহা অবহেলা কর, আর নয়ন তুচ্ছ কর, পা দিয়া ঠেলিয়া ফেল। যাহার জন্য ছুটিলে, যাহাতে কতদিন থেকে কত সুখের আশা করিতেছিলে, যাহার জন্য জাগিয়া জাগিয়া কত স্বপ্ন দেখিতেছিলে, তাহা পাইলে। মন কি পরিতৃপ্ত হইল ? কই, তাহাতে আশানুযায়ী সুখ কই ? কিছু সুখ পাইলে, তাও আবার রহিল কতক্ষণ ? আশার ন্যায় চিত্রকর দেখি নাই, মন ভুলানো ছবি আঁকিতে পারে। কিন্তু সে ছবি মরীচিকার ন্যায়, কাছে যাও পাইবে না। যাহা হারাইলে স্মৃতির সাহায্যে আশা তাহার একটি মনোরম চিত্র আঁকিয়া সম্মুখে ধরিল, তাহার জন্য প্রাণ কাঁদিল, আবার তাহার দিকে ধাবমান

হইলে। ছুটাছুটি, ক্রমাগত ছুটাছুটি। এইরূপ ছুটাছুটি করিয়া কত লোকের জীবন কাটিতেছে। এরূপ ছুটাছুটিতেও একপ্রকার সুখ আছে, সত্য। কিন্তু সে সুখে তৃপ্তি হয় না, তাহাতে শান্তি নাই। সে সুখ জ্বরগ্রস্ত লোকের পক্ষে জলের ন্যায়, পিপাসা মেটে না, বরং যতই পান করে, ততই যেন পিপাসা বাড়ে। যে স্বর্গ পাইতে চেষ্টা করে তাহার সুখ শান্তিময়!

এই উচ্চ হিমালয় শিখরে হউক, বা নিম্ন বঙ্গদেশে হউক, দরিদ্রের কুটিরে হউক বা রাজপ্রাসাদে হউক, সকল স্থানেই, স্বর্গ, সুখ, শান্তি পাওয়া, বা অন্ততঃ পাইতে চেষ্টা করা যায়। বাস্তবিক কোন মানুষ সশরীবে স্বর্গ পাইয়াছে কি না জানি না। শুনিয়াছি, যুধিষ্ঠির পাইয়াছিলেন, গৌতম প্রভৃতি আরও কোন কোন মহাত্মাও পাইয়া থাকিবেন। স্বর্গ পাও না পাও, স্বর্গের রাস্তাতেও চলিতে সুখ। কেহ কেহ বলিবেন, স্বর্গে যাইবার এক অপেক্ষাকৃত সহজ পথ আছে - এই জনশূন্য স্থানে আজীবন থাকা। কিন্তু সে এক প্রকার আত্মহত্যা করা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেরূপ করিয়া স্বর্গ পাওয়াকে, সশরীরে স্বর্গ পাওয়া বলা যায় না। আর বাস্তবিক স্বর্গের উপযুক্ত হইতেছ কি না, সংসারে না মিশিলে বুঝা যায় না। এখানে হয় ত মন খুব উন্নত, দেবতুল্য হইল। কিন্তু সংসারের প্রলোভনে পদস্খলন হইয়া স্বর্গ হইতে নরকে পড়িবে না, কে বলিতে পারে ?

(ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৮, পৃ ১৩৭)

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা

১২৯৫ সালের আশ্বিন মাসের 'ভারতী'তে দেখান হইয়াছিল, যে শিল্প এবং খনিকার্য্যের বিস্তার ব্যতীত ভবিষ্যতে আমাদের জীবনধারণ দুরূহ হইবে, এবং ইহার জন্য বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্য কারণেও বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতির পুস্তক পাঠে মন যেরূপ উন্নত ও প্রশস্ত হয়, বিজ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানান্ধকার যেরূপ শীঘ্র তিরোহিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। বিজ্ঞানের রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে। ভাষা, ইতিহাস, প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়েও বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলিত হইতেছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা আজকাল এরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে, তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলা সময় নষ্ট করা মাত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল বিজ্ঞান শিক্ষার যাহাতে বিস্তার হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা অধিকবয়স্ক; এবং তাঁহাদের পঠিতব্য পুস্তক ইংরাজি। বিজ্ঞানের সম্যক চর্চ্চার জন্য তরুণ বয়সেই উহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এরূপ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই উত্তমরূপে সম্ভব। তাহা ছাড়া, ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা বাঙ্গালা পুস্তকের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞান বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন। ইহা নূতন কথা নহে, অনেকদিন পূর্বে এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে চলিতেছে। যতগুলি আমরা দেখিয়াছি, সমস্তই ইংরাজি বই হইতে অনুবাদিত ও সংকলিত। কিন্তু অনুবাদ বা সংকলন যে সহজ কাজ নহে, তাহা যিনি বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষণরূপে জানেন। অতএব যাঁহারা যত্ন এবং কষ্ট করিয়া প্রথমে এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, বাঙ্গালা বিজ্ঞান ভাষা গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে ঋণী।

দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কত পুরাতন মত বদলাইতেছে। অতএব, কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক লিখিতে হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি, ২/৪ বৎসরের মধ্যে এমন কি ২/৪ মাসের মধ্যে যে সকল নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।

আবার যাহা সত্য তাহা বরাবরই সত্য রহিবে, কখনও মিথ্যা হইবে না। কিন্তু

সত্য ব্যতীত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পস্তকে অনেক মতামত প্রকাশিত হয়, যাহা অনেকটা কল্পনাপ্রসূত, অতএব পরিবর্তনশীল। ঐ সকল পুস্তক হইতে অনুবাদ এবং সঙ্কলন করিতে হইলে অপরিবর্তনীয় সত্য হইতে এরূপ মতামতের প্রভেদ জানা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পুস্তকে আর একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। রচনা সাধ্যমত হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা করিতে হইলে যদি সত্যকে বিকৃত করিতে হয়, তাহা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ভুল শিক্ষা করা অপেক্ষা অশিক্ষিত অবস্থায় থাকা ভাল, বিশেষতঃ সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে।

বাঙ্গালা ভাষায়, কি অন্য যে কোন ভাষায়, বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিতে হইলে, এই তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা অতিশয় শক্ত কার্য্য। যিনি যে বিজ্ঞানে পারদর্শী তিনি সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ইহা ভালরূপে করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমরা কয়েকখানি প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আমাদের অর্থ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙ্গালাভাষার একজন স্রষ্টা। তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণী। তাঁহার ভাষা সরল এবং হৃদয়গ্রাহী, রচনা কৌশল অতি চমৎকার। তাঁহার 'চারুপাঠ' নামক গ্রন্থ অনেক দিন হইতে বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অক্ষয়বাবু বিজ্ঞান বড় ভালোবাসিতেন, বিজ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 'চারুপাঠে' বিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সকলগুলিরই বিষয় উত্তমরূপে বাছা হইয়াছে, সকলগুলিরই ভাষায় অক্ষয় দত্তের ছাপ লক্ষিত হয়। আমরা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই উহাদিগের দোষ দেখাইতেছি।

চারুপাঠ প্রথমভাগের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব, — 'আগ্নেয়গিরি'। উহার প্রথম ছত্র এই —

"কোন কোন পর্ব্বতের শিখর দেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণ জল ও ধাতুনিঃস্রব প্রবলবেগে নির্গত হয়। সেই সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয়-গিরি"।

(চারুপাঠ, প্রথমভাগ, দ্বিচত্বারিংশবার মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৮৮৯, ৭ পৃষ্ঠা)ঃ

'আগ্নেয়গিরি'র—ইংরাজি প্রতিশব্দ 'বল্কেনো'। প্রথমতঃ 'বল্কেনো' কখন কখন আদৌ গিরির আকার ধারণ না করিতে পারে। করিলেও কেবল শিখর দেশেই সে 'বল্কেনো'র মুখ বিদ্যামান থাকে তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে, 'বল্কেনো' গিরির আকার ধারণ করিলে, ঐ গিরির চতুষ্পার্শে ছোট বড় অনেক গহ্বরের মুখ লক্ষিত হয়। ভূপৃষ্ঠের নিম্নদেশ (অর্থাৎ ভূগর্ভ) হইতে আগত উর্ধ্বগামী অত্যুত্তপ্ত ধাতব নিস্রবের ধারা যেখানেই ফাটা ফুটা পাইবে, অথবা স্বতেজে ফাটাফুটা করিয়া লইতে সক্ষম হইবে, সেইখানে দিয়াই বহির্গত হইবে—কোন একটি নির্দিষ্ট মুখ দ্বারাই যে ক্রমাগত

নির্গত হইবে, তাহা কোন ক্রমেই ঠিক নহে, গহ্বরই বল্কেনোর প্রধান অঙ্গ। ঐ গহ্বর অত্যন্ত গভীর। উহা দ্বারা যে সকল ধাতব নিস্রব বা প্রস্তর খণ্ড নির্গত হয়, তাহা গহ্বরের চতুষ্পার্শ্বে জমাট বাঁধিয়া বা রাশীকৃত হইয়া সচরাচর গিবির আকার ধারণ করিয়া থাকে বটে। কিন্তু ঐ গিরি যে গহ্বর দ্বারা নিস্রবাদি উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় 'বল্কেনোর' অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নহে। উহা নিস্রব বা প্রস্তরখণ্ড সমূহেব উৎক্ষেপের ফলমাত্র। কেঁচোর বাসস্থান সম্বন্ধে তাহার পায়ু পরিত্যক্ত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বল্মীক যেরূপ, 'বল্কেনো' সম্বন্ধে 'বল্কেনো' গিরিও অনেকটা সেইরূপ। গহ্বর ব্যতীত 'বল্কেনো' থাকিতে পারে না; কিন্তু 'বল্কেনো' গিরির আকার ধারণ না করিতেও পারে। অতএব 'বল্কেনো'কে আগ্নেয়গিরি বলা সঙ্গত নহে, ঐ গিবির শিখরদেশেই যে বল্কেনোর গহ্বর থাকে তাহা নহে। 'আগ্নেয়গিরির' পরিবর্ত্তে 'আগ্নেয় গহ্বর' শব্দটি ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয়তঃ 'ধূম', 'ভস্ম', 'অগ্নিশিখা' দ্বারা সকলেই এরূপ বুঝিয়া থাকে যে বল্কেনোর ভিতর কি যেন পুড়িতেছে, এবং সেই দাহ্যমান পদার্থ হইতে 'ধূম', 'ভস্ম', 'অগ্নিশিখা' বাহিব হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ 'বল্কেনো'র ভিতর দাহ্যমান কোনই পদার্থ নাই। উহা হইতে যে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা আদৌ 'ধূম' নহে — প্রধানতঃ কুয়াসার ন্যায় জলীয় বাষ্প মাত্র। যাহা 'ভস্ম' বলিয়া বোধ হয়, তাহা পাথরের গুঁড়া। যাহা 'অগ্নিশিখা' বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, তাহা আদৌ 'অগ্নিশিখা' নহে, অত্যুষ্ণ তরল নিঃস্রবের জ্যোতিঃ মাত্র; ইহা বাষ্পময় আকাশে প্রতিফলিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় দেখায়।

অতএব চারুপাঠে 'আগ্নেয়গিরি'র যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রম সংকুল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাল্যকালে স্মরণশক্তি অতি প্রবল থাকে; ছাত্রেরা তখন যাহা শিখে তাহা শীঘ্র ভুলে না। তজ্জন্য অল্প বয়স্ক বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের তৃতীয় প্যারা (৮ পৃষ্ঠা)ঃ

'পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপন্ন হইবার যেরূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা লিখিত হইতেছে। নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল বস্তুরাশিও সেইরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সাগরের জল যেমন কম্পিত হইয়া তরঙ্গ উপস্থিত করে, অবনীগর্ভস্থ উল্লিখিত অগ্নিময় মহাসাগরও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া তরঙ্গমালা উৎপাদন করে। ঐ তরঙ্গ লাগিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশের কোন কোন স্থান কম্পিত, স্ফীত, ও বিদীর্ণ হয়।' ইত্যাদি।

নারিকেলের মত পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তরলপদার্থে পরিপূর্ণ কিনা তদ্বিষয়ে

বিশেষ মতভেদ আছে। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ঐ মতের বিরোধী। বস্তুতঃ আজকাল উহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন ভূবিদ্যা - বিশারদ পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগও উপরিভাগের ন্যায় কঠিন, তার মধ্যে মধ্যে তরল পদার্থ পূর্ণ গহ্বর থাকিতে পারে। আবার, কেহ কেহ বলেন যে কঠিন অভ্যন্তরভাগ এবং কঠিন উপরিভাগের মধ্যে তরল বা অর্ধতরল পদার্থের একটি পাতলা স্তর বিদ্যমান আছে। যে মত সর্ব্ববাদি বা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, তদ্বিষয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় নহে। তাছাড়া এখানে এরূপ একটি মত শিখান হইতেছে, যাহার পরিপোষক আজকাল অতি বিরল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরলপদার্থের 'অগ্নিময় মহাসাগর' আছে, স্বীকার করিলেও, উহার তরঙ্গ লাগিয়া ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন, বিদারণ ও উদগমন হয় মনে করা কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মত নহে। ভূগর্ভের তাপাতিশয্য প্রযুক্ত, তৎপ্রবিষ্ট জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এই বাষ্পের প্রসারণশক্তি কিরূপ তাহা কেৎলিতে জল ফুটাইলে কতকটা বুঝা যায়। কেৎলির জল ফুটিলে, তাহার কিয়দংশ বাষ্প হইয়া যায়। এবং ঐ বাষ্প স্বীয় প্রসারণ শক্তি বলে কেৎলির ঢাকনিকে ঠেলিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে, ও ঢাকনি কাঁপিতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের অধঃস্থিত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইলে ঐ বাষ্প ভূ-পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে। ইহাতে ভূ-পৃষ্ঠের আঘাত লাগে, এবং ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। ভূমিকম্পের এই একটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায় — স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা অনুমান মাত্র। জলীয় বাষ্পের তেজে ভূ-পৃষ্ঠ কোথাও কোথাও বিদারিত হইতে পারে; এবং এইরূপে যে সকল ফাটাফুটো জন্মে, তদ্বারা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে তরল ধাতব - নিস্রবও উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে।

'পুরুভুজ' শীর্ষক প্রবন্ধে (৩৭ পৃষ্ঠা)ঃ

পুরুভুজ, পলা ও স্পঞ্জ একশ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ শম্বুক এবং পলাতে যত প্রভেদ, পলা এবং স্পঞ্জে প্রায় তত প্রভেদ ! আবার স্পঞ্জ বাস্তবিক জন্তু কি উদ্ভিদ তাহা অদ্যাপি নিরুপিত হয় নাই লেখা হইয়াছে। নিরূপিত বহুকাল হইযাছে, অন্ততঃ ৩০/৩৫ বৎসর পূর্ব্বে। স্পঞ্জ যে জন্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিয়ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লেখা হইয়াছে (৪৩ পৃ:)ঃ-

'বীজ কোষস্থ বীজ সমূহের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি সম্পাদন বিষয়ে অনেক পুষ্পে এক প্রকার অতি মনোহর অদ্ভুত কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে। যে পুষ্পের পরাগ কেশর বড় আর গর্ভকেশর ছোট তাহা উর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে, এবং যে পুষ্পের পরাগকেশর ছোট গর্ভকেশর বড় তাহা ভূতলের দিকে অধোমুখ হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভকেশরের শিরোভাগ পরাগকেশরের

শিরোভাগের অপেক্ষায় নীচে থাকে। সুতরাং পরাগকেশরস্থ রেণু সমুদায় সহজেই গর্ভকেশরে পতিত হইয়া বীজ কোষস্থ বীজ সমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করে। এতাদৃশ সুচারু কৌশল না থাকিলে পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিত।'

কতকগুলি উর্দ্ধমুখ ফুলের পরাগকেশর বড় এবং গর্ভকেশব ছোট; এবং কতকগুলি অধোমুখ ফুলের পরাগকেশর ছোট এবং গর্ভকেশর বড়। ইহাদের কোন একটি ফুলের পরাগ রেণু যে সেই ফুলটির গর্ভকেশরে পড়িয়া উহাব নিষেক কার্য সম্পন্ন কবে তাহা অতীব সম্ভব। কিন্তু এই সকল ফুলেও পতঙ্গেরা বসিয়া থাকে, এবং তাহারা এক ফুলের পরাগ রেণু লইয়া ভিন্ন ফুলের গর্ভকেশরে স্থাপিত করিয়া শেষোক্ত ফুলের নিষেক কার্য্য সংসাধিত করিতে পারে। বস্তুতঃ প্রকৃতির 'অদ্ভুত' এবং 'সুচারু' কৌশল সাধারণতঃ আত্ম-নিষেক (self fertilisation) বন্ধ করিতে; আত্ম-নিষেকের পক্ষে নহে। যে সকল পুষ্পে পরাগকেশব এবং গর্ভকেশর উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মধ্যেও যাহাতে কোন ফুলের পুষ্পরেণু সেই ফুলের বীজোৎপাদন না করিতে পারে, তজ্জন্য নানাবিধ চমৎকার চমৎকার কৌশল দৃষ্ট হয়।

উপরে যাহা বলা গেল তাহাতে চারুপাঠের ন্যায় উৎকৃষ্ট পুস্তকে কিরূপ দোষ আছে—পাঠক বুঝিতে পারিবেন। অক্ষয়বাবু বিজ্ঞান শিক্ষার যেরূপ উৎসাহী ছিলেন, তাহাতে তিনি জীবিতাবস্থায় বহুদিন ধরিয়া পীড়িত না থাকিলে, সম্ভবতঃ এ সকল দোষ লক্ষিত হইত না।

আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। অক্ষয়বাবু বড় ধার্ম্মিক ছিলেন। চারুপাঠের প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উহা কতদূর ফলপ্রদ হইবে সন্দেহ। তৃতীয় ভাগ চারুপাঠে 'জীব বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা', শীর্ষকপ্রস্তাবে, বহুরূপ নামক একটি প্রাণীর বর্ণ পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন 'যিনি সমুদ্রতটস্থ বালুকা-বিন্দু ও দুর্ব্বাদলস্থ শিশির বিন্দু পর্যন্ত কোন বস্তু নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অত্যদ্ভুত জন্তুকে, এই অদ্ভুত শক্তি নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক সম্পাদনার্থ প্রদান করিয়াছেন, ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহার সন্দেহ নাই। মক্ষিকাদি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাবসিদ্ধ খাদ্য। উহা বৃক্ষ ও গুল্ম আরোহণ ও রসনা প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মৃদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে অবলীলাক্রমে পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ পতঙ্গের দৃষ্টিশক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী, কোন হিংস্র জীব নিকটস্থ হইলে তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব, কোন প্রকার

ছদ্মবেশ গ্রহণ ব্যতিরেকে বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভব না, এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরমপুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তনের শক্তি প্রদান করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।'

কিন্তু বালকদিগের নিকট ইহাতে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইবে কিনা, তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়। আমাদের বিবেচনায় বিপরীত ফল হইতে পারে। 'বহুরূপ' ছদ্মবেশে ক্ষুদ্রপতঙ্গদিগকে না ঠকাইয়া আপনার উদরপূর্ত্তি করিতে অক্ষম, তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাকে ছদ্মবেশ দিয়াছেন, হহা বড় ভয়ানক শিক্ষা! ইহা ধর্ম্মের মূলে, নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। কথাটা দাঁড়াইতেছে কিসে? জগদীশ্বর প্রবঞ্চনা করিতেছেন! অথবা তাঁহার একটি জীবকে এরূপ করিয়া গড়িয়াছেন যাহাতে সে প্রবঞ্চনা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না, এবং যাহাতে সে অক্লেশে প্রবঞ্চনা করিতে পারে। সে যে প্রবঞ্চনা করে তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য! এখানে যে কার্য্য 'সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, পরমপুরুষের' উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহা কোন মানুষে করিলে তাহাকে আমরা ঘৃণা করিব না কি? মনে কর, কোন ব্যক্তি দেখিল যে কতকগুলি লোক প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য পাইতেছে না। সে ইহাদিগকে এরূপ চাতুরী শিখাইল যাহাতে ইহারা ধরা না পড়িয়া, অন্যান্য লোককে ঠকাইয়া, বা অন্য লোকের বাড়ীতে চুরি করিয়া বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে এবং উদর ভরিয়া খাইতে পারে। ঐ ব্যক্তির কি আমরা বুদ্ধির এবং শক্তির তারিফ করিব? না উহাকে এক বাক্যে ধিক্কার দিব? এসকল প্রশ্ন কি ছাত্রদিগের মনে উদয় হইতে পারে না? আবার, 'বহুরূপ' যেরূপ ঈশ্বরের জীব, ক্ষুদ্র পতঙ্গও সেইরূপ ঈশ্বরের জীব। ন্যায়বান্ ঈশ্বর বহুরূপের এত পক্ষপাতী কেন হইবেন? ক্ষুদ্র বলিয়া বেচারি পতঙ্গ কি তাঁহার দয়ার পাত্র নহে?

বিজ্ঞান বিষয়ক আরও খান দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই পুস্তক দুইখানি ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর পরীক্ষার্থী বালকদিগের জন্য। উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করা গিয়াছে, শেষোক্তটি ব্যতীত আর সকলগুলিই উহাতে বিদ্যমান আছে। অবশ্য কোন পুস্তকই নির্দ্দোষ হইতে পারে না; তবে মাত্রার ন্যূনাধিক্য আছে— উহাতে মাত্রা বেশি বলিয়া বোধ হইতেছে । উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে একখানি শ্রীযুক্তবাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যয় প্রণীত "ভূবিদ্যা বিষয়ক পাঠ অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোল"। এ বৎসর ইহার অষ্টবিংশ সংস্করণ হইয়াছে। ইহার ৫ম পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে - 'ভূপঞ্জরের অধস্তন স্তরে কোন জীব শরীরের নিদর্শন পাওয়া যায় না।' পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে এখন মতভেদ প্রায় নাই বলিলেই হয়। এওজুন নামক একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল ব্যতীত, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তর সমূহে স্থানে স্থানে কয়লার ন্যায় এক প্রকার উদ্ভিজ্জসম্ভূত খনিজ পদার্থ (গ্র্যাফাইট) দৃষ্ট হয়। ঐ পৃষ্ঠায়—'এক্ষণে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গমকালে তন্মধ্য হইতে দ্রবময় পদার্থ উৎক্ষিপ্ত

হইয়া যেরূপ প্রস্তরে পরিণত হয়, অধস্তন স্তরগুলি তাদৃশ প্রস্তরময়; এ জন্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এক্ষণে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেরূপ প্রস্তর উৎপন্ন হয়, পুরাকালে সেইরূপ ভূগর্ভস্থ ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে অধস্তন স্তরাবলীর প্রস্তরসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, সুতবাং এই সকল স্তরকে অগ্নিসম্ভূতস্তর ও ইহাদের অন্তর্গত প্রস্তরকে আগ্নেয় প্রস্তর বলে।'

আগ্নেয় গহ্বরোৎক্ষিপ্ত নিস্রব ভূ-পৃষ্ঠে যেরূপ প্রস্তবে পরিণত হয়, ভূপৃষ্ঠের অধস্তন স্তর-সমূহ তাদৃশ প্রস্তরময় নহে। উহাতে জলজ প্রস্তর বিশেষ পরিমাণে আছে। আগ্নেয় প্রস্তর থাকিতে পারে, এবং আছে, কিন্তু তদ্রূপ প্রস্তর উহার উপরিতল স্তরসমূহের মধ্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে।

৮ পৃষ্টায়—'কোন কোন আরণ্য প্রদেশের ভূভাগ মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া যাওয়াতে তত্রত্য উদ্ভিদ্‌রাশি দীর্ঘকাল ভূগর্ভে থাকিয়া কালক্রমে পাথরিয়া কয়লা রূপে পরিণত হইয়াছে', ইহা পড়িয়া পাথরিয়া কয়লার প্রকৃত উৎপত্তি পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দূরে থাকুক, তিনি যাহা বুঝিবেন সম্ভবতঃ তাহা একেবারে ভুল। ইহাতে এরূপ বুঝায় নাকি যে, মাটির ভিতর জঙ্গল বসিয়া গিয়া, সেখানে অনেক দিন থাকিয়া পাথরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে? কোন নিবিড় জঙ্গলময় ভূভাগ অবনত হইয়া জলমগ্ন হইল; পরে ঐ জঙ্গল নদীবাহিত পলি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া, ক্রমে পাথরিয়া কয়লায় পরিণত হইবে। সকল পাথরিয়া কয়লা যে এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নয়; কিন্তু সাধারণতঃ হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে, কোন জঙ্গল ভূগর্ভের ভিতর বসিয়া গিয়া কখনও পাথরিয়া কয়লা উৎপন্ন করিয়াছে কি না সন্দেহ।

৬১-৬৩ পৃষ্ঠা-'ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পলি-মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহাতেই অনুমান হয়, গঙ্গার পলি-মৃত্তিকা সাগর গর্ভে পতিত হইয়া এই ভূভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। ..... রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির মৃত্তিকা এই পলি-মৃত্তিকা অপেক্ষা কঠিন। বোধ হয়, পলি-মৃত্তিকাময় প্রদেশের পূর্ব্বে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল। ..... বিন্ধ্যপর্বত তাহা (করহরবালীর কয়লার স্তর) অপেক্ষাও প্রাচীন। .....পঞ্চকোট, দামোদর, করহরবালী প্রভৃতি স্তরের নিম্নস্থ স্তরে কোন জীব কঙ্কাল দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অনেকস্থলে শীত প্রধান দেশের উদ্ভিদের বিনাশাবশেষ নিহিত রহিয়াছে, ইহাতে বোধ হয় অতি পূর্ব্বকালে উক্ত প্রদেশ হিমময় ছিল। .....

'যে শক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে নর্ম্মদা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সহ্যাদ্রির শতশত শৃঙ্গ দিয়া আগ্নেয পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিত' ইত্যদি।

পুস্তকখানির মধ্যে মধ্যে এই প্রকার নানা কথা আছে যাহা অসংলগ্ন এবং যাহা ঠিক নহে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পলিমাটি দেখা যায়, যথার্থ—সবই পলিমাটি। কিন্তু তাহা হইতেই অনুমান করা কি যুক্তি সঙ্গত যে, গঙ্গার পলিমাটি

সাগর গর্ভে পড়িয়া এই ভূভাগ উৎপন্ন করিয়াছে? পলিমাটি নদীগর্ভে, বিলে, হ্রদে পড়িয়া স্থল নির্ম্মিত করিয়াছে এবং প্রতিবৎসর করিতেছে। বস্তুতঃ উল্লিখিত ভূভাগ সাগর নিক্ষিপ্ত গঙ্গার পলিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে আমরা পলি দেখিতে পাই বলিয়া যে সেখানে সমুদ্র ছিল এরূপ অনুমান কোন মতেই ন্যায়-সঙ্গত নহে। ইহাতে ছাত্রেরা পলির সহিত সমুদ্রের অত্যাজ্য সম্বন্ধ বুঝিবে— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন আমরা ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে যে পলি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই বিলে এবং নদীর তীরে বা নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির মৃত্তিকা কি পলি মৃত্তিকা নহে? সমুদয় বিন্ধ্য পর্ব্বত করহরবালীর কয়লার স্তর অপেক্ষা প্রাচীন নহে; কিয়দংশ বটে। পঞ্চকোট, দামোদর এবং করহরবালী স্তর সমূহের নিম্নস্থ তাল্চীর নামক স্তর বৃন্দে জীব কঙ্কাল দৃষ্ট হয়।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এককালে শীতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল সত্য, কিন্তু তাহার প্রমাণ 'শীত প্রধান দেশের উদ্ভিদের বিনাশাবশেষ' নহে। সে প্রমাণ অন্যরূপ। নীহারাবৃত পর্ব্বত হইতে যে নীহারবাহু (গ্লেসিয়র) নামিয়া থাকে, তাহাতে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড আবদ্ধ দেখা যায়। ঐ সকল প্রস্তর খণ্ডে কখনও কখনও এক প্রকার সংঘর্ষণ জনিত আঁচড় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নস্থানে গরমের জন্য বরফ গলিয়া গেলে তদাবদ্ধ প্রস্তরখণ্ডসমূহ নীহারবাহুর মুখে স্তূপীকৃত হয়। উহার আকৃতি আঁচড় (যদি থাকে) ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া, উহা বর্তমানে নীহারবাহু হইতে যতদূর থাকুক না কেন, এককালে বরফ-বাহিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। দাক্ষিণাত্য এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে পূর্বোক্ত তালচীরাস্থ স্তরাবলীতে ঐ প্রকার প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; এবং উহা দ্বারা ঐ প্রদেশে তাল্চীরকালের শীতাধিক্য অনুমিত হইয়াছে।

"সহ্যাদ্রির শত শত শৃঙ্গ দিয়া আগ্নেয় পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক— কোন "শৃঙ্গ" দিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আগ্নেয় গহ্বর দুই প্রকার — ১) সুগভীর কূপের ন্যায় গর্ত্ত, যথা বঙ্গোপসাগরের ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয় গহ্বর; ২) সুগভীর লম্বা ফাটা (Dyke), বোম্বাই এবং মালব প্রদেশে নিস্রবাদির উৎক্ষেপ প্রায়ই এই প্রকার ফাটা (Dyke) দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সহ্যাদ্রি এবং বিন্ধ্যাচলের অধিকাংশ ঐ সকল উৎক্ষিপ্ত পদার্থে নির্ম্মিত। উহাদের যে সকল শৃঙ্গ দেখা যায়, তাহা বিসুবিয়াস্, এটনাদি আগ্নেয় গহ্বরের ন্যায় নহে। পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্গ সমূহ বৃষ্টির কার্য্যে খোদিত হইয়াছে।

১১২ পৃষ্ঠা– "তুষার ক্ষেত্র"। যে যে প্রদেশের উন্নত ভূমি চির তুহিনাচ্ছন্ন, শীতাতিয্য হইলে তাহার সন্নিহিত ভূমিখণ্ড বরফে আবৃত হয়। নরওয়ে দেশের মালভূমিতে এইরূপ ঘটে। কোন উন্নত স্থান হইতে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে, বিশাল তুষারক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। যে দেশে বিস্তীর্ণ মালভূমি নাই, সেখানে পর্ব্বতশ্রেণী সমূহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নস্থানে তুষার সঞ্চিত হয়, এই সকল

ভূভাগে বৃষ্টির পরিবর্তে তুষারপাত হয়, সুতরাং গ্রীষ্মাগমে উহা দ্রব হইতে না পারিলে কালক্রমে উহা পর্ব্বতাকার হইয়া উঠে। গ্রীনল্যাণ্ড দেশে কয়েক শত ফুট পুরু হইয়া বিশাল তুষার ক্ষেত্র অবস্থিতি করিতেছে। ঈদৃশ ক্ষেত্রের প্রান্তভাগ কখন কখন ভগ্ন হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিকটবর্তী নিম্নপ্রদেশ অভিমুখে ধাবমান হয়। ইহা হিমশিলা নামে খ্যাত।

"হিমশিলা"। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেব উন্নত পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশ চিবদিন তুষারাবৃত থাকে। শীতকালে তাহার নিম্নদেশের অনেক দূর পর্য্যন্ত তুষারমণ্ডিত হয়। গ্রীষ্মাগমে এই তুষাররাশি দ্রব হইতে থাকে, তখন তাহার নিকটে গমন করিলে কখন কখন সহসা হিমশিলা স্খলিত হইয়া সমীপস্থ হতভাগ্য মনুষ্যদিগকে একবারে চূর্ণ ও প্রোথিত করিয়া ফেলে। এক একটি হিমশিলা এত প্রকাণ্ড যে তাহার দৈর্ঘ্য এক মাইল ও উচ্চতা এক শত ফুট। উপত্যকা ও গহ্বর হিমশিলা জমিবার উপযুক্ত স্থান। হিমশিলার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তব খণ্ডাদি চালিত হইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে নীত হয়।

"মেরু সন্নিহিত সাগরে যে সকল হিমশিলা ভাসমান থাকে, তাহাদের আকাব আরও বৃহৎ।"

এখানেও বড় গোলযোগ। গ্রন্থকার "তুষার ক্ষেত্র" বা "হিমশিলা" দ্বারা কি বুঝিয়াছেন. বা কি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক করা অসাধ্য। "যে দেশে বিস্তীর্ণ মালভূমি নাই, সেখানে পর্ব্বতশ্রেণী সমূহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নস্থানে তুষার সঞ্চিত" হইবে, তাহার কোন কথা নাই। মানবদেশ একটি বিস্তীর্ণ মালভূমি; কিন্তু সেখানে কই তুষার সঞ্চিত হয় না। সিকিমে বিস্তীর্ণ মালভূমি নাই; কিন্তু সেখানে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী "নিম্নস্থানে তুষার সঞ্চিত" হয় না, বরঞ্চ উচ্চস্থানেই হইয়া থাকে। ১৬/১৭ হাজার ফুটের উপর হিমালয় চির তুষারাবৃত। তাহার নিম্নে ১৪/১৫ হাজার ফুটের উপর সেপ্টে ম্বর মাসেই বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়; আরও নীচে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত শীতকালে তুষার পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই সকল স্থানে তুষার জমিয়া কখনও "পর্ব্বতাকার" ধারণ করে না, শীঘ্রই গলিয়া যায়। এবং গ্রীষ্মাগমে যখন কোন নিম্নস্থানের "তুষাররাশি দ্রব হইতে থাকে, তখন তাহার নিকটে গমণ করিলে কখন কখন সহসা হিমশিলা স্খলিত হইয়া সমীপস্থ হতভাগ্য মনুষ্যদিগকে একেবারে চূর্ণ ও প্রোথিত করিয়া ফেলে"— একথাটি ঠিক নহে। পর প্যারাতে "হিমশিলা" দ্বারা এখানে যেন "Glacier" বুঝাইতেছে।

কিন্তু ইহার একছত্র পূর্ব্বেই "হিমশিলা" দ্বারা "avalanche" বুঝা যায়। আবার শেষ ছত্রে হিমশিলা দ্বারা "iceberg" বুঝা যাইতেছে। "glacier", "avalanche" এবং "iceberg" অনেক প্রভেদ।

শীতপ্রধান দেশেই হউক আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই হউক, চিরতুষার সীমার উপর বৃষ্টির পরিবর্তে তুষার পড়িয়া থাকে। হিমালয়ে ঐ সীমা সমুদ্রজল সীমা হইতে

১৬/১৭ হাজার ফুটের উপর; মেরু সন্নিহিত স্থানে উহা শেষোক্ত সীমার সহিত সমোচ্চ হইতে পারে। চিরতুষার সীমার উপর কখনও এরূপ গরম হয় না যাহাতে তুষার গলিতে পারে। তথাপি সেখানেও তুষার বৎসরের পর বৎসর জমিয়া "পর্ব্বতাকার" হইতে পারে না। তুষার (snow) জমাট বাধিয়া বরফে(ice) পরিণত হয়। মেরু সন্নিধানে, যেখানে চির তুষারসীমা এবং সমুদ্র জলসীমা সমোচ্চ বা প্রায় সমোচ্চ বরফরাশির সমুদ্র সন্নিহিতাংশ ক্রমে ক্রমে সমুদ্রে ভাসিয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ বা গ্রীষ্ম প্রধানদেশে চির তুষার সীমার উপর যে বরফ সঞ্চিত হয়, তাহা দুই উপায়ে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমতঃ কখন কখন উচ্চ এবং খাড়া স্থান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফখণ্ড স্খলিত হইয়া বেগে নিম্নস্থানে অবতরণ করে। ইহাকে ইংরাজীতে "avalanche" বলে। গ্রন্থকার ইহাকে একস্থানে 'হিমশিলা' বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শীতকালে যে সকল নিম্নদেশ তুষারমণ্ডিত হয়, 'গ্রীষ্মাগমে এই তুষাররাশি দ্রব" হইয়া "হিমশিলা" উৎপন্ন করে না। চিরতুষার সীমার উপর যে নীহার সঞ্চিত হয়, তাহার স্থানান্তরকরণ যদি কেবল "avalanche" এর উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে উহার অতি অল্পাংশই স্থানান্তরিত হইত। তাহা হইলে কাঞ্চনজিঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত হইয়া যে কত উচ্চ হইত, তাহার ইয়ত্ত্বা করা যায় না। কিন্তু উহার স্থানান্তরিত হইবার একটি উৎকৃষ্ট উপায় আছে। উহা নিম্নস্থানে, উপত্যকায় অবতরণ করে। "avalanche" এর ন্যায় বেগে নহে, কিন্তু আস্তে আস্তে — এত আস্তে যে দেখিলে উহা যে আদৌ চলিতেছে তাহা বোধ হয় না। এই অতি মন্দ গতি নীহাররাশিকে ইংরাজীতে "Glacier" বলে; ইহাকে একটি প্রকাণ্ড বরফনদী বলা যাইতে পারে। ফর্ব্বু নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে ইউরোপে এইরূপ একটি বরফনদীর দৈনিক গতি পার্শ্বে ১৩/১৯১/২ ইঞ্চ এবং মধ্যস্থলে ২০/২৭ ইঞ্চ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কোন কোন গ্লেসিয়র (অথবা নীহার বাহু) ২০/৩০ মাইল দীর্ঘ, ন্যূনাধিক ১ মাইল প্রশস্ত এবং ৮০০ ফুট বা ততোধিক স্থূল দেখা যায়। নীহারবাহু চিরতুষার সীমার অনেক নীচে নামিয়া থাকে; হিমালয়ে ঐ সীমা যদিও ১৬/১৭ হাজার ফুট, সেখানে নীহার বাহু প্রায় ১২০০০ ফুট পর্যন্ত নামিয়া থাকে। গ্রন্থকার উপত্যকায় যে "হিমশিলা জমিবার" কথা লিখিয়াছেন, তথা সম্ভবতঃ এই নিম্নদেশে অবতীর্ণ নীহারবাহু। নীহারবাহুর প্রান্তভাগে বরফ গলিয়া বেগবতী নদী উৎপন্ন হয়। চিরতুষার সীমার উপর কাঞ্চনজিঙ্গাদি পর্ব্বতাংশে যে তুষারপাত হয়, তাহাব পরিণাম এই। তত্রস্থ তুষাররাশি সংহত হইয়া, আস্তে আস্তে সহস্র সহস্র ফুট নীচে নামিয়া গলিয়া জল হইয়া যায়।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইতেছে, বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তকের কিরূপ দোষ আছে বা থাকিবার সম্ভব, পাঠক বোধ হয় তাহা আভাস পাইবেন। ইহার প্রতিকার কি ?

আজকাল নানারকমে সভা সমিতি হইতেছে — সুচিহ্ন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য একটি সভা হইলে ভাল হয় না কি ? এরূপ সভার সভ্যগণ অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি সাবকমিটি ইতিহাসের ভার লইবেন; একটি সাবকমিটি বিজ্ঞানেব ভার লইবেন; এইরূপ কতকগুলি সাবকমিটিতে সভার কার্য্য বিলি করা যাইতে পারে। ইংল্যান্ডের ন্যায় দেশে পুস্তক প্রকাশের কার্য্য পুস্তক বিক্রেতারাই করিয়া থাকে। ম্যাকমিলান, লংমান প্রভৃতি পুস্তক বিক্রেতারা ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকে। এখানে সেরূপ পুস্তক প্রকাশক নাই। এখানে বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকের প্রচলন অনেকটা-প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের হাতে। ইঁহাদিগের দ্বারা — অজানতই হউক, আর যাহাই হউক - ব্যক্তি বিশেষের উপর যেরূপ অন্যায়াচরণ সম্ভব, একটি সভার উপর সেরূপ সম্ভবে না; বিশেষতঃ যদি সভাটি ক্ষমতাশালী হয়। পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য এখন কলিকাতায় টেক্সট্ বুক কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। ইহার ভিতর অনেক মান্যগণ্য পণ্ডিত লোক আছেন। কিন্তু প্রথমতঃ ইঁহারা সব বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ইঁহারা পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন মাত্র। নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশ করেন না।

উল্লিখিত সভা স্থাপনের প্রস্তাবটি বোধ হয় নূতন নহে। এখনও যে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহার আশা করা যায় না; কিন্তু যতদিন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে না।

(ভারতী ও বালক, ১৪ বর্ষ, আশ্বিন ১২৯৭ পৃ ৩৪১-৫১)

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপায় কি ?

ভারতবাসী অতিশয় দরিদ্র। কৃষকেরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অনাবৃষ্টির ত কথাই নাই; এক বৎসর ভাল বৃষ্টি না হইলে, চারিদিকে হাহাকার রব শুনিতে পাওয়া যায়। শিল্পকারদের ব্যবসা চলে না; তাহারা ক্ষুৎপীড়িত কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির জন্য লালায়িত। ত্রিশ, চল্লিশ টাকা বেতনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটেরা উমেদার। যেখানে যাও, দুঃখ কষ্ট দারিদ্রের দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।

দেশে দারিদ্র দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, অনেকের এরূপ বিশ্বাস। ইহা অমূলক নহে। প্রতি বৎসর দেশ হইতে ন্যূনাধিক বিশ কোটি টাকা বিলাতে যাইতেছে। এই প্রকারে কত টাকা চলিয়া গিয়াছে! একদিকে এরূপ শোষণ চলিতেছে, অন্যদিকে দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় কয়েকজন ব্যবসায়ী, জমিদার, উকীল ও মোটামাহিনার চাকুরে ব্যতীত, সকলেই নির্ধন। ইঁহারা দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন, কেহ কেহ করিয়াও থাকেন। ইঁহারা দেশের ধনবৃদ্ধিতেও কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, অথবা যদি হয় ত অতি অল্প পরিমাণে। ইঁহারা ধনী, গরীব কৃষক ও শিল্পকারের ধনে। দেশের ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে "নিষ্কর্মা" বলা যাইতে পারে। এই সকল "নিষ্কর্মা" লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই অবস্থা ভাল, অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ, কোনরূপ প্রকারে সংসার চলে। কৃষক- দিগের অবস্থা মন্দ, শিল্পকারীদের অবস্থা মন্দ। যাহারা কৃষক ও শিল্পকারীদের উপার্জ্জিত ধনে জীবনধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ। জীবন-সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে, আরও হইবে। এক্ষণে উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বোতভাবে বিধেয়। কিন্তু উপায় কি?

যে শোষণের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যে অংশের জন্য গবর্ণমেন্ট দায়ী, তাহার হ্রাসের জন্য বিলাতে ও এদেশে আন্দোলন চলিতেছে, গবর্ণমেন্টও কতকটা চেষ্টা করিতেছেন। অধিক সংখ্যক ভারতবাসী দ্বারা গবর্ণমেন্টের কাজ চালাইলে এবং অন্যান্য উপায়ে তাহার হ্রাস হইতে পারে, এবং কালে হইবেও; কিন্তু

অধিক পরিমাণে সম্ভব নহে। ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা যে শান্তি ও সুফল লাভ করিয়াছি তাহার মুল্য হিসাবে ধর, অথবা ব্রিটিশ রাজ্যের কর হিসাবে ধর, ব্রিটিশ সেনা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেন্সনাদির জন্য প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইবে। ইহা অনিবার্য। যে পরিমাণে টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে সেই পরিমাণে দেশের মূলধন কমিতেছে, এবং দেশ গরীব হইতেছে। আরও যাহাতে গরীব না হইয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা কর্ত্তব্য, না করিলে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। কিন্তু উপায় কি?

এই প্রশ্নের সংক্ষেপ এবং সহজ উত্তর—দেশের ধনবৃদ্ধি। ইহা কি কি উপায়ে সম্ভব দেখা যাউক।

প্রথমতঃ শিল্পকর্ম্ম। কৃষিজ, অরণ্যজ বা খনিজ পদার্থ হইতে অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করাকে শিল্পকর্ম্ম বলা যায়। তুলা হইতে কাপড়, ইন্ডিয়া রবার হইতে ওয়াটার প্রুফ, লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ, এবং লৌহ হইতে ছুরি কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত করা শিল্পকর্ম্ম। শিল্পই দেশের ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায়। ইংল্যান্ড প্রভৃতি যে সকল দেশ ধনী তাহা প্রধানতঃ শিল্পের জন্য। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, আমরা নানাবিধ শিল্প বিদেশে রপ্তানি করিতাম। কিন্তু এক্ষণে সে সব শিল্প লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এক্ষণে, আমাদের শিল্প বিদেশে পাঠান দূরে থাকুক, তাহার পরিবর্তে বিদেশীয় শিল্প আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা পরি বিলাতী ধুতি, বিলাতী জামা, মাথায় দি বিলাতী ছাতা। আপীসে যাই বা সভায় বক্তৃতা করি বিলাতী প্যান্টুলুন, বিলাতী কোট, বিলাতী মোজা এবং বিলাতী জুতা কষিয়া। আমাদের সচরাচর ব্যবহার্য্য অধিকাংশ জিনিসই বিলাতী। আমাদের মধ্যে যাঁহারা "সভ্য" তাঁহারা আহার করেন বিলাতী বাসনে, বিলাতী ছুরি কাঁটা ও চামচে, পান করেন বিলাতী গেলাসে। আমাদের থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি বিদেশী ধাতু নির্ম্মিত, কিন্তু এখানে প্রস্তুত হয়; তাহাও বোধহয় কিছুদিন পরে বিলাত হইতে আমদানি হইবে। আর কত নাম করিব? বিলাতী শিল্পের আমদানি দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প মারা যাইতেছে; ইহা চোখ খুলিয়া দেখিলে চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা আমরা সর্বদা প্রত্যক্ষ করি, তাহা আরও হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষ বহুদিন হইতে লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ এবং তন্নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে দিল্লীতে "কুতব" নামে যে লৌহস্তম্ভ আছে, তদ্রুপ স্তম্ভ কয়েক বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় কোন কারখানায় নির্ম্মিত হইতে পারিত না। এখনও ইউরোপে অতি অল্প কারখানা আছে, যেখানে এরূপ প্রকাণ্ড স্তম্ভ প্রস্তুত হইতে পারে। যদিও "কুতব" নামে অভিহিত, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে এই স্তম্ভ প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ১৫০০ বৎসর ইহা খাড়া রহিয়াছে,

কত ঝড়, বৃষ্টি, বাদ্‌লা ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাতে মরিচা ধরে নাই। আরও অন্যান্য স্থানে অনেক বড় বড় প্রাচীন লৌহ-নির্ম্মিত কামান ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় "ইস্পাত" পূর্ব্বে অতি আদরণীয় ছিল; ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য স্থানে যাইত। জগদ্বিখ্যাত ডামাস্কাস তরবারি ভারতীয় ইস্পাতে নির্ম্মিত হইত। এক্ষণে প্রতি বৎসর বিলাতী লোহা ও ইস্পাতের আমদানি বাড়িতেছে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশী লোহা ও ইস্পাত লোপ পাইতেছে। লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্রাদি এবং ছুরি কাঁচি ইত্যাদি দ্রব্য ছাড়া, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার লৌহ এবং ৫ লক্ষ টাকার ইস্পাত বিলাত হইতে আমদানি করিতাম। কিন্তু ১৮৮৫ সালে আমরা অন্যূন ২ কোটি টাকার লোহা এবং ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইস্পাত আমদানি করি। অতএব ৩০ বৎসরের মধ্যে লোহা এবং ইস্পাতের আমদানি প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়াছে। (লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র এবং ছুরি কাঁচি ইত্যাদি দ্রব্য ছাড়া, এবং গবর্ণমেন্ট বিলাত হইতে যে লোহা আনিয়াছেন তাহা ছাড়া, ১৮৬৮ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ১৮ বৎসরে আমরা ২৪,৬০,৮৭,৫৪৩ (প্রায় চব্বিশ কোটি একষট্টি লক্ষ) টাকার লোহা আমদানি করিয়াছি।)

শিল্পের অনুকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেরূপ লোহার আমদানি বাড়িয়াছে, সেইরূপ কার্পাসবস্ত্রেরও আমদানি বাড়িয়াছে। অথচ আমাদের দেশে কার্পাস অপর্য্যাপ্ত। এখান হইতে কার্পাস ম্যাঞ্চেস্টারে যায়, এবং সেখানে বস্ত্রে পরিণত হইয়া ফিরিয়া আসে। লোহা এবং কাপড়ের ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিসের আমদানি বাড়িয়াছে। তাহা এখানে প্রস্তুত হইতে পারে, যাহা প্রস্তুত করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে।

এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে দেশীয় শিল্প ত্যাগ করিতে, এবং বিদেশীয় শিল্প ব্যবহার করিতে হুকুম দেন নাই। বরঞ্চ আমাদের শিল্পোন্নতি চাহেন বলিয়া থাকেন। আমাদের শিল্পোন্নতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে; এবং দেশের ধন বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেন্টের লাভ। সত্য বটে ইউনাইটেড স্টেটস্, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বিদেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক লইয়া, তাহার আমদানি কমাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণমেন্ট তাহা করেন না, এবং কখনও করিবেন না। কিন্তু করিলেও বিলাতী শিল্পের বিরুদ্ধে আমাদের প্রাচীন দেশীয় শিল্প সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইত না। তাহার কারণ স্পষ্ট। আমাদের প্রাচীন শিল্প বিনাশ পাইয়াছে, স্বাভাবিক কারণে। লোকে চায় সস্তা জিনিস। আমাদের প্রাচীন শিল্পকারদের বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য ছিল, কিন্তু তাহা হাতের। আমাদের শিল্প সম্পাদিত হইত হাতে। অথবা এরূপ কলে, যাহাকে বিলাতী কলের কাছে খেলনা-কল বলা যাইতে পারে। হাতে জিনিস প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম অনেক, কাজেই তাহাদের দাম বেশী, কিন্তু বিলাতী শিল্প সম্পাদিত হয়, কলে, কলে যে কত কাজ কত অল্প সময়ে সম্পন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ

না করিলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং কলের জিনিস শস্তা, বিলাতী এবং দেশী ধূতির দাম তুলনা করিলে তাহার কত প্রভেদ, কে না জানেন? অথচ কলের সূতা হইতেই দেশী ধূতি তৈয়ার হয়। এক্ষণে হস্ত নৈপুণ্যের দিন অতীত হইয়াছে; আজকাল কল কৌশলের রাজ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই কলকৌশলের বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অল্প পরিশ্রমে সচরাচর ব্যবহার্য্য জিনিস প্রস্তুত হইতেছে, এবং ততই তাহার দাম কমিতেছে। এরূপ অবস্থায় হস্ত-নির্ম্মিত জিনিসের মরণ নিশ্চয়। আমাদের প্রাচীন শিল্পের পুনর্জীবন, প্রাচীন উপায়ে অসম্ভব; নবজীবন সম্ভব আধুনিক উপায়ে। আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত আমাদের গতি নাই। ইহার জন্য দুইটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন।

১ম। বিজ্ঞান শিক্ষার, বিশেষতঃ যেরূপ শিক্ষা শিল্পে প্রয়োজনীয় তাহার বিস্তার। আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের মূলভিত্তি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উন্নতিই পাশ্চাত্য শিল্পের উন্নতির মূল কারণ। এদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সাধারণের ইহাতে আস্থা নাই; বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চেষ্ট। আমরা যে শিক্ষা চাহ, তাহাতে কেরানিগিরি বা ওকালতী ভিন্ন জীবনধারণের প্রায় অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হই না। কলম ও বাক্য ব্যতীত শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রামের অন্য কোন অস্ত্র নাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে দেশের এমন অবস্থা হইবে, যখন অন্যান্য অস্ত্র ব্যতীত চলিবে না। এখনি তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যেরূপ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিল্পের উন্নতি সম্ভব, ইংলণ্ডে তাহার বিশেষ বিস্তার হইয়াছে। তথাপি ইংরাজেরা সন্তুষ্ট নহেন; যাহাতে ঐরূপ শিক্ষার আরও বিস্তার হয়, তজ্জন্য ইংল্যাণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়াছে। সভা স্থাপিত হইয়াছে, পার্লিয়ামেন্ট বিল পাশ করিতেছেন। আমাদের শিল্প লোপ পাইয়াছে, দেশ গরীব হইতেছে, দেশের অর্দ্ধেক লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তথাপি আমরা কি চেষ্টা করিতেছি?

২য়। সমবেত চেষ্টা। দিন কত "টেকনিক্যাল এডুকেশন" লইয়া সভায় বক্তৃতা ও খবরের কাগজে লেখা হইল। কিন্তু সমবেত এবং ক্রমিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় কোথায়? শিল্পোন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক প্রথানুসারে শিল্প চালাইতে হইলে, অনেক মূলধনের আবশ্যক। তাহা সচরাচর একজনে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। অতএব, বড় বড় কল কারখানা প্রায়ই কোম্পানি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা এইরূপে একত্র হইয়া কতগুলি সূতার ও কাপড়ের কল চালাইতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে অগ্রসর হন না, তাঁহারা একত্র হইয়া কার্য্য করিতে জানেন না। একাকী যিনি যাহা করিতে পারিলেন করিলেন; একত্র হইয়া কার্য্য করিতে চান না। দলাদলি সর্ব্বত্র আছে; কিন্তু এখানে দলাদলির যেরূপ প্রাদুর্ভাব, সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও

নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা একত্র হইয়া কার্য করি নাই; সে শিক্ষা আমরা পাই নাই। বর্ত্তমান দুববস্থার তাহাই একটি প্রধান কাবণ। কারণ যাহাই হউক, যতদিন আমরা একত্র হইযা কার্য করিতে না শিখিতেছি, ততদিন আমাদের দ্বারা দেশেব প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

সূতার কল, কাপড়ের কল, কাগজের কল, আর যাহারই কল, এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সকল কল চলিতেছে, তাহা বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতবর্ষীয় বা ইউরোপীয়দিগের। আমরা ইহা দেখিয়াও দেখি না। সত্য বটে, আমাদের শিল্পোন্নতির পথ সহজ নহে। অন্যান্য গবর্ণমেন্টের ন্যায় আমাদের গবর্ণমেন্ট বিদেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক লইবেন না। ইহা দেশীয় তরুণ শিল্পের পক্ষে অতিশয় হানিজনক। কিন্তু, গবর্ণমেন্ট দেশীয় শিল্প কিনিতে প্রতিশ্রুত। যে দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, এবং যাহার মূল্য সেইরূপ বিলাতি দ্রব্য হইতে অধিক নহে, গবর্ণমেন্ট তাহা এখানে কিনিবেন। আমরাও যদি যথাসাধ্য দেশীয় শিল্প ব্যবহার করি, তাহা হইলে অনেকটা উপকার সম্ভব। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে দেশীয় শিল্প ব্যবহার করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা (বাঙ্গালীরা) অন্যান্য ভারতবাসী অপেক্ষা সভ্য, আমরা বিলাতী জিনিষ পাইলে দেশী জিনিষ চাই না। আমরা একটিও সূতার কল, একটিও কোনরূপ শিল্পের কল চালাইতেছি না।

দেশের দারিদ্র্য শিল্পোন্নতির এক প্রতিবন্ধক। যেখানে টাকার সুদ শতকরা ১২ কি ১৫ কি ততোধিক, সেখানে যাহাদের মূলধন আছে, তাহারা যে তাহা কেবল সুদে খাটাইবেন তাহা বিশেষ আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের দারিদ্র যে বোম্বাই প্রদেশের অপেক্ষা অধিক তাহা বোধ হয় না। ভাল করিয়া চালাইলে শিল্প হইতেও বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। শিল্পোন্নতি না হইলে দেশের দারিদ্র্য বাড়িবে, যে সকল ধনবান্ কি মধ্যবিত্ত লোক দেশের হিত কামনা করেন, তাঁহাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, তাঁহারা যদি সকলে একত্র হইয়া উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আমরা চেষ্টা করিলে, কেবল যে আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড় , লোহা, কাগজ প্রভৃতি জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি এমত নহে, তাহার কোন কোন জিনিস বিদেশেও রপ্তানি করিতে পারি।

তৃতীয়তঃ। খনিজ পদার্থ দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। শিল্পের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে হীরক এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি ধাতু ঘটিত আকরিক পদার্থের খনি ছিল, তাহার নিদর্শন অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পের ন্যায় আমাদের খনি কার্যও প্রায় লোপ পাইয়াছে। যেরূপ শিল্পে, সেইরূপ ইহাতেও আমরা একেবারে নিশ্চেষ্ট। এক্ষণে খনির কার্য্য ইউরোপীয়দিগের প্রায় একচেটিয়া বলা যাইতে পারে। আমরা যে খরচে ঐ সকল কাজ করিতে সক্ষম হইতে পারি তাহা

অপেক্ষা নানা কারণে তাঁহাদের অনেক খরচ করিতে হয়। তথাপি তাঁহারা খনির কাজ করিতেছেন, এবং অনেক স্থলে লাভের সহিত। যে যে উপায়ে শিল্পের, সেই সেই উপায়ে খনিকার্য্যেরও উন্নতি সম্ভব— শিক্ষা এবং সমবেত চেষ্টা। কেহ কেহ বলিতে পারেন, পূর্বে যাহারা খনির কার্য করিত, তাহারা কোন শিক্ষা পাইত না। কিন্তু এক্ষণে তাহা সম্ভবে না কেন? তাহার কারণ প্রথমতঃ ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালেই সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ ব্যতীত যে যে খনিজ পদার্থ জমির উপর বা অল্প নীচে ছিল তাহার প্রায় সব উত্তোলিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল পদার্থের জন্য জমির অনেক নীচে অনুসন্ধান করিতে হয়; তজ্জন্য শিক্ষার বিশেস প্রয়োজন। দ্বিতয়তঃ পূর্ব্বে যে সকল উপায়ে ধাতুঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্তুত করা হইত, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই সকল নূতন এবং উন্নত উপায় অবলম্বন ব্যতীত, খনিজ পদার্থোত্তলনে লাভের সম্ভাবনা নাই ; এবং তাহার জন্য শিক্ষা এবং মূলধন আবশ্যক। তৃতীয়তঃ পাথরিয়া কয়লা, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন ; পূর্ব্বে উহা খনিত হইত না। উহা দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা; কিন্তু শিক্ষা এবং যথেষ্ট মূলধন ব্যতীত লাভের সহিত উহার উত্তোলন সম্ভব।

আমরা "উচ্চশিক্ষা" পাইয়াছি, উচ্চশিক্ষার গৌরব করি, কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পেট্রোলিয়ম বা লৌহ তাম্রাদি ধাতুঘটিত আকরিক পদার্থ বা পাথরিয়া কয়লা কি? ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? কিরূপ স্থানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া সম্ভব? কিরূপে উহা খনিত হইতে পারে? কোন্ পুস্তকে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্ব পাওয়া যায়? তত্ত্ব পাইলেও তাহা বুঝিতে পারি কি না? এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নির্ব্বাক হইবেন। ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের কোন্ নিভৃত জঙ্গলে কোন্ খনিজ পদার্থ আছে, কোন স্থানে কোন্ খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিলে লাভের সম্ভাবনা, তাহার খবর রাখেন; ঐরূপ খবর রাখিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাঁহারা তাহা পাইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে খবর ছাপাইয়া থাকেন। খবরাখবর লওয়া এবং ছাপানর খরচ আমরা দিয়া থাকি; অথচ আমরা তাহার কিছুই জানি না। কোথায় খবর পাওয়া যায় তাহাও জানি না, পাইলেও বুঝি না, বুঝিতে চেষ্টাও করি না। অথচ ইংল্যান্ডে কোন্ সালে কে রাজা হইয়াছিল, কোন যুদ্ধ কোন্ সালে হয়, কে হারে কে জিতে, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, উত্তর কণ্ঠস্থ। সেক্সপিয়ার, মিলটন, যে সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার টীকা টিপ্পনি অভ্যস্থ।

চতুর্থতঃ। কৃষিকর্ম্ম। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি প্রাচীন। যে সকল জমি উর্ব্বরা, বহুকাল হইতে তাহা কর্ষিত হইতেছে। যে সকল সহজ প্রাপ্য সারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িতে পারে, আমাদের কৃষকেরা বহুকাল হইতে তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অল্প ব্যয়ে, যে সকল সহজ উপায়ে

কৃষিব উন্নতি সম্ভব, বহুদিন তাহা অবলম্বিত হইয়াছে। পাট প্রভৃতি চাষের বিস্তারে কোন কোন স্থানে চাষের উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু সে উন্নতি সামান্য। গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে মডেল ফার্ম স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এবং কৃষি শিক্ষার বিস্তার দ্বারা কতকটা উন্নতি সম্ভব। কিন্তু অদ্যাপি বিশেষ যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহাব লক্ষণ দেখা যায় না। আজ কয়েক বৎসর হইতে গমের রপ্তানি বাড়িতেছে। তাহা দেখিয়া অনেক মনে করেন যে, গমের চাষের বৃদ্ধি বা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সন্দেহ-স্থল। ইউরোপে আমাদের গম অন্যান্য দেশের গম অপেক্ষা সস্তা মূল্যে বিক্রীত হয়, এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল স্থান দুর্গম ছিল, সেখানে রেলওয়ের বিস্তাব হইতেছে, গমের রপ্তানি বৃদ্ধির এই দুইটি প্রধান কারণ, ইহাই আমাদের ধারণা। ছত্রিশগড়ে রেলওয়ে যাওয়াতে সেখানকার অনেক গম এক্ষণে রপ্তানি হয়; কিন্তু ছত্রিশগড়ের চাষের বিশেষ কোন উন্নতি বা বৃদ্ধি লক্ষিতহয় না। পূর্ব্বে সেখানে যে গম সঞ্চিত থাকিত এক্ষণে তাহা বিদেশে চলিয়া যায়। পূর্ব্বাপেক্ষা দাম অনেক চড়িয়াছে কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাতেও ছত্রিশগড়ের বিশেষ লাভ কি না তাহা সন্দেহ। অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষের সময় তাহা বুঝা যাইবে।

যে সকল চাষে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা- যথা চা এবং তামাকের চাষ – তাহাতে কিছু শিক্ষা এবং মূলধনের প্রয়োজন। তাহা আমাদের সাধারণ কৃষকের এক প্রকার সাধ্যাতীত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বড় বড় খনিকার্য্যের ন্যায় এই সকল চাষ ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার একচেটিয়া। কোথাও আসামের অস্বাথ্যকর জলা জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাঁহারা "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া আসিয়া, অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সেখানে গিয়া চাষ করিতেছেন। আমরা এ সকল কার্যে বড় একটা অগ্রসর হই না। ফল এই দাঁড়াইতেছে - ইউরোপীয় চালিত শিল্প এবং খনিকার্য্যের ন্যায় এ-সকল কৃষিকর্ম্মের লাভ বিলাত চলিয়া যাইতেছে — যে লাভ এখানে থাকিলে দেশের ধন বৃদ্ধি হইত।

আমাদের দারিদ্র্যের জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্ট দায়ী তাহা নহে। গবর্ণমেন্টের উপর সমুদয় দোষ চাপাইয়া কেবল গবর্ণমেন্ট দ্বারা যতটুকু দারিদ্র্যমোচন হইতে পারে, তাহার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের দারিদ্র ঘুচিবে না। এই দারিদ্রের জন্য আমরা নিজেরাও অনেকটা দায়ী, সম্ভবত গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে। আমরা নিজেরা যে যে উপায়ে আমাদের এবং দেশের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টাবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেবল কলম এবং বাক্য পরিচালনায় কখনও কোন দেশের উন্নতি হয় নাই, কখনও কোনও দেশের উন্নতি হইবে না।

(ভারতী, ১২ বর্ষ, ১২৯৫, আশ্বিন, পৃঃ ৩০১ - ৩০৮)

ভারতে বিলাতী সভ্যতা

১। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সর্ব্ববাদি সম্মত; এই দারিদ্র্য যে দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাও অনেকের ধারণা। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বিশ কোটি বা ততোধিক টাকা বিলাতে চলিয়া যায়, যাহার বিনিময়ে আমরা কোন জিনিস পাই না— এই বাৎসরিক শোষণ আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকে বলেন, সে যাহাই হউক, এই যে আমরা বিশ কোটি টাকা বিলাতে পাঠাই তাহার বিনিময়ে যে আমরা কিছুই পাইনা সে কথা ঠিক নহে; তাহার বিনিময়ে আমরা বিলাতী সভ্যতা পাইয়াছি।

ইহা সত্য, তবে উদর ভরিয়া খাইতে না পাইয়া, এত টাকা দিয়া, আমরা যে জিনিসটি কিনিতেছি, তাহা একবার 'যাচাই' করা আবশ্যক। জিনিসটি কত পরিমাণে খাঁটি, কত পরিমাণে বা তাহাতে 'খাদ' আছে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

২। প্রথমতঃ ব্রিটিশ রাজ্যে যুদ্ধ বিপ্লব প্রায় বন্ধ হইয়াছে; শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবাসী এবং ব্রিটন, সকলেই এক বাক্যে ইহা বলিয়া থাকেন, ইহার সত্যতা বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তি সভ্যতা বিস্তারে সহায়তা করে মাত্র। যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও অনেক দেশকে সভ্য হইতে দেখা গিয়াছে। নেপোলিয়নের সময় হইতে ফ্রাঙ্কো জরমান যুদ্ধ পর্য্যন্ত ফ্রান্স দেশে কত বিপ্লব আলোড়িত হইল, তথাপি ঐ কালে ফরাসীরা সভ্যতার পথে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল।

শান্তি যে সকল অবস্থাতেই উন্নতিব্যঞ্জক, তাহা নহে। ভারতবর্ষে শান্তি আছে বলিয়াই যে উহার উন্নতি হইতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে।

এক্ষণে ভারতে বিলাতী সভ্যতা বিস্তারের যে সকল চিহ্ন সচরাচর প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে বাস্তবিক আমাদের কতদূর প্রকৃত উন্নতি প্রকাশ করে, দেখা যাউক।

৩। রেলরোড, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। রেলরোড এবং টেলিগ্রাফের বিস্তার ভারতের বিলাতী সভ্যতার বিশেষ পরিচায়ক এবং বিট্রিশ রাজ্যের বিশেষ গৌরব বলিয়া বিঘোষিত হয়। উহাতে যে আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাতায়াতের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া এক মাসে যাওয়া যাইত, এখন সেখানে অনায়াসে একদিনে যাওয়া যায়। টেলিগ্রাফের

প্রসাদে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শত শত ক্রোশস্থিত বন্ধুবান্ধবের সমাচার পাইয়া থাকি। কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে রেলরোডের সাহায্যে দেশের চারদিক হইতে সেখানে ভক্ষ্য দ্রব্য আনা যায়। যেখান দিয়া রেলরোড গিয়াছে, সেখানকার ফসলের দাম চড়িয়াছে, কৃষকের লাভ হইয়াছে। গতিবিধির সুবিধা হওয়াতে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী সকলে মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিতে সক্ষম হইয়াছে; পরস্পরের সৌহৃদ্য বাড়িতেছে।

জগতে প্রায় কিছুই অমিশ্রিত ভাল বা অমিশ্রিত মন্দ নাই। যাহাকে ভাল বলি, সাধারণত তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অংশ অধিক; যাহাকে মন্দ বলি, সচরাচর তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অপেক্ষা মন্দর ভাগ অধিক। রেলরোড যে কেবলই আমাদের উপকার বা উন্নতির সহায়ক করিতেছে তাহা নহে। ইহা দ্বারা ক্ষতিও হইতেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া রেলরোডের ভাল মন্দ উভয় পক্ষ বিচার করিয়া দেখা যাউক। সম্প্রতি ছত্রিশগড়ের ভিতর দিয়ে নাগপুর বেঙ্গল রেল বোড গিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে ফসল অপর্য্যাপ্ত হইত এবং অতিশয় শস্তা ছিল, এমনকি শুনা যায়; কখন কখন ক্ষেত হইতে সমুদয় শস্য লওয়া হইত না, সেইখানেই পচিয়া যাইত। রেলরোডের পূর্ব্বে যে কখনও ছত্রিশগড়ে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল শুনা যায় নাই। এক্ষণে, রেলরোডের দরুণ ছত্রিশগড়ের ফসলের মূল্য বাড়িয়াছে, পূর্ব্বে যেখানে চাউলের সের দুই পয়সা ছিল এক্ষণে সেখানে ৪ পয়সা হইয়াছে। কৃষকের ইহাতে কম লাভ নহে।

কিন্তু প্রথমতঃ অন্ততঃ সমুদয় লাভ কৃষকের ঘরে যায় না। কৃষকেরা অনেক কার্য মজুর দিয়া করায়। শস্যের দাম চড়িয়া যাওয়ায়, মজুরদিগের মজুরি কিছু বাড়িয়াছে, যদিও যতদূর বাড়া উচিত ততদূর বাড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। অতএব লাভের কিয়দংশ মজুরদিগকে না দিলে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অসম্ভব। যে জমি রেলরোডের যত নিকটবর্ত্তী, তাহার খাজনা তত বেশী হইয়া থাকে। অতএব লাভের আর এক অংশ চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ শিল্পজীবিদের দুরবস্থা। এখনও ছত্রিশগড়ে সহস্র সহস্র তন্তুবায় আছে; এখনও কোন কোন স্থানের লোকেরা লৌহ গালাইয়া জীবনধারণ করে। রেলরোডের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কাপড় এবং বিলাতী লোহার বিস্তার হইলে ইহাদের অন্ন মারা যাইবে। তখন ইহারা কৃষিকার্য্য বা মজুরি অবলম্বন করিবে। সকল লোকই কৃষক এবং মজুর হইলে , জননী বসুন্ধরা ক্রমে তাহাদের খাদ্য যোগাইতে নিশ্চয়ই অসমর্থ হইবেন।

তৃতীয়তঃ শস্যের রপ্তানি বৃদ্ধি। রেলরোডে শস্যের রপ্তানির সুসার করিয়া দেয়। পূর্ব্বে বলদের পৃষ্ঠে অল্প স্বল্প শস্য ছত্রিশগড়ের বাহিরে যাইত। এক্ষণে শত শত মণ চাউল, গম রেলগাড়ীতে লইয়া যায়। পূর্ব্বে কোন বৎসর ফসল কম হইলে

সঞ্চিত শস্য থাকা প্রযুক্ত লোকের বিশেষ কষ্ট হইত না। এক্ষণে অধিক দাম পাইয়া টাকার লোভে, আপনাদের নিতান্ত যাহা দরকার তাহা রাখিয়া সমুদয় উদ্বৃত্ত শস্য কৃষকেরা বিক্রয় করে। এক্ষণে সঞ্চিত ফসল অতি অল্পই থাকিবে। সুতরাং দুর্ব্বৎসরে বিশেষরূপে অন্নকষ্ট হওয়া সম্ভব।

চতুর্থতঃ টাকার অপব্যয়। এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, কৃষকেরাত সে শস্য বিক্রয় করে, যাহা তাহাদের দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়, তাহার উচিত মূল্য পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে না হয় শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে টাকা জমাইয়া রাখিবে। দুর্ভিক্ষ হইলে, রেলরোডের অন্য স্থান হইতে খাদ্য যোগাইবে, কৃষকেরা সঞ্চিত টাকা দিয়া তাহা কিনিবে। কথাটি শুনিতে বেশ, কিন্তু যিনি কৃষকেরা সচরাচর কিরূপ লোক জানেন, তিনি ওরূপ কথা বলিবেন না। প্রায়ই তাহারা অতিশয় অদূরদর্শী। ভবিষ্যতের ভাবনা বড় ভাবে না । অশিক্ষিত লোকের স্বভাব এইরূপই হইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, প্রায়ই তাহারা খরচ করিয়া ফেলে। টাকা যেরূপ খরচ করা যায়, সঞ্চিত চাউল বা গম সেরূপ করা যায় না। অনেক চাষারা মদ খাইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, তাহারা যে মাত্রা চড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার, রেলরোডে অনেক চাকচিক্যশালী শস্তা কিন্তু অনাবশ্যকীয় বিলাতীর জিনিস চাষার দ্বারা হাজির করিবে, খরচের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

অশিক্ষিত লোকদিগের মন "রাঙ্গা চোঙ্গা খেলনা" জিনিসে ভুলিয়া যায়। হাতে টাকা থাকিলে, ভবিষ্যতে দুর্ব্বৎসরে কি খাইবে, ইত্যাদি ভাবিয়া, যে উহার ক্রয় হইতে বিরত হইবে তাহা সম্ভব নহে; যেখানে মোটা কাপড়ে আরামে চলিত, সেখানে চকচকে সাটিন বা বনাত চাই; যেখানে দুই পয়সার দেশী খেলনায় ছেলেরা আনন্দে নাচিত, সেখানে তাহার আটগুণ দামের খেলনা ব্যতীত তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিবে না। এইরূপে একদিকে যেরূপ কৃষকেরা রেল বিস্তারের জন্য অধিক টাকা পাইবে, সেইরূপ অন্যদিকে উহার নিরর্থক ব্যয়েরও উপায় বাড়িবে। অধিকন্তু আগে যে দুর্ব্বৎসরের ভরসা সঞ্চিত শস্য দেশে থাকিত এখন আর তাহা থাকিবে না। যাহার যেরূপ আয় তদনুযায়ী সে খেলনা প্রভৃতিতে যদি খরচ করে তবে সেরূপ খরচ কুফলদায়ক হয় না। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা আপনাদের আয় বুঝিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া খরচ করিতে প্রায়ই অক্ষম দেখা যায়।

ভারতবর্ষের একটি বিভাগ সম্বন্ধে রেলরোডের যেরূপ কুফল ফলিতেছে এবং ফলিবে, দেখা গেল অন্যান্য স্থান সম্বন্ধেও সেইরূপ কুফল ফলিয়াছে। রেলরোড তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়জীবিদিগের অবস্থা খারাপ করিয়াছে, বা খারাপ করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ বাধ্য হইয়া কৃষিজীবি হইয়াছে। একদিকে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে; কর্ষণযোগ্য পতিত জমি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র অতি কমই দেখা যায় বা দেখা যায় না। অন্যদিকে

পূর্ব্বে যাহারা শিল্পকার্য্যে জীবনধারণ করিত, এখন তাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, কৃষকের জীবন সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে; চারিদিকে অন্নকষ্ট বাড়িতেছে।

রেলরোডে আমাদের সভ্যতাকল্পে কিরূপ সাহায্য করে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা আমাদের সভ্যতার নিদর্শন নহে । ভারতবর্ষে অন্যূন নয় হাজার মাইল রেলরোড আছে এবং তৎসঙ্গে সোন, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর বৃহৎ বৃহৎ সেতু দেখা যায়। আমরা ঐ সকল রেলরোডে ভ্রমণ করি এবং সেতুর নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের তারিপ করি। কিন্তু ঐ সকল রেলরোড এবং সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে কাহারা? ব্রিটনবাসীরা। উহা বিলাতী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচায়ক; আমরা যে ঐ সভ্যতা পাইয়াছি তাহা আদৌ প্রকাশ করে না। ঐ সকল রেলরোড নির্ম্মিত হইয়াছে ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা; উহার নির্ম্মাণে যে মূলধন লাগিয়াছে তাহার অধিকাংশ যোগাইতেছেন ব্রিটনবাসীরা; উহা পরিচালিত হয় ব্রিটনবাসী দ্বারা। স্টেশনমাষ্টার গিরি অথবা কোন কোন ক্ষুদ্র রেলওয়েতে মধ্যে মধ্যে গার্ড বা ড্রাইভারগিরি ছাড়া ভারতবাসী ভারতীয় রেলওয়েতে কোন বড় কার্যে নিযুক্ত দেখা যায় না। ভারতবাসী যে অপারক — সে কথা হইতেছে না, রেলওয়ে সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত অবস্থা কি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। এরূপ আলোচনা করিলে রেলরোডের বিস্তারে আমাদের কোন গৌরবের বা আত্মপ্রসাদের কারণ দেখা যায় না।

রেলরোড সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, টেলিগ্রাফ এবং বড় বড় খাল সম্বন্ধেও তাহা খাটে। ইহাও ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্ম্মিত এবং পরিচালিত—ইহাও ব্রিটিশদিগের উন্নতির পরিচায়ক, আমাদের নহে।

রেলরোডের ভাল মন্দ দেখা গেল। পাঠক ওজন করিয়া কোনটা গুরুতর দেখিবেন; কেহ কেহ মন্দটাই গুরুতর মনে করিবেন। তাঁহাদের এরূপ মনে করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে যাহার উল্লেখ করা হয় নাই। ভবিষ্যতে যদি ভারতবাসী এরূপ সভ্য হয় যে তাহারা আপনাদের চেষ্টাতে, আপনাদের টাকাতে, আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে বিস্তীর্ণ রেলরোড প্রস্তুত করিতে পারে, তখন তাহারা দেখিবে যেত সমুদয় পথ বন্ধ। যেখানে রেলরোড করিলে লাভের সম্ভাবনা, সেখানে রেলরোড প্রস্তুত রহিয়াছে। বর্ত্তমান রেলরোডে আমাদের উন্নতি হয় নাই দেখা গিয়াছে, ভবিষ্যতে যে উন্নতি হইবে, তাহারও পথ বন্ধ করিয়াছে।

তবে কি এত রেলরোড না হইলে ভাল হইত? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি বাঞ্ছনীয় হয়, যদি তাহার জন্য আশুলাভে বঞ্চিত হওয়া ভাল হয়, তাহা হইলে না হইলেই ভাল ছিল। ব্রিটিসকৃত এবং ব্রিটিসচালিত ৯ হাজার মাইল রেলরোডের পরিবর্ত্তে যদি ভারতবাসীকৃত এবং

ভারতবাসী চালিত ৯০ মাইল রেলরোড দেখিতাম, তাহা হইলে ভারতবাসীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইত।

৪। শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিস রাজ্যের প্রধান গৌরব। তাহাতে আমাদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। শাক্যসিংহের সময় হইতে চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্ম সংস্কারক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুই সহস্র বৎসরের প্রচারে যে ফল ফলে নাই; একশত বৎসরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় সে ফল ফলিয়াছে; বর্ণভেদের মূলে কুঠারাঘাত লাগিয়াছে। পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষা অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল; এক্ষণে উহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র সকলেরই সম্পত্তি। বিদ্যালয়ের ভিতরে উচ্চনীচ সকল জাতিকেই একত্রে একই বিষয় পড়িতে হয়; পরীক্ষা পুরস্কারে উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। বিদ্যালয়ের বাহিরে চাকরি, মান, সম্ভ্রম, উচ্চনীচ সকলেরই সমান প্রাপ্য। তেলি, তামুলি, চাষা, ধোপা প্রভৃতি যে সকল জাতি সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের নেতৃদলে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষেরই যে মনুষ্যত্বে অধিকার পাশ্চাত্য শিক্ষা সেই সাম্য ভাবটিকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার প্রভাবে অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। কোন সময়ে কোন পদার্থ কোন ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষ দ্বারা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল তাহা উদরস্থ বা এমনকি স্পর্শ করিলে তুমি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। জাহাজে চড়িলে পাপ হইবে, নীচ বর্ণের সহিত খাইলে জাতি হারাইবে। বিধবা বিবাহ করিলে এক ঘরে হইবে। এই প্রকার যে সকল কুসংস্কার আমাদের সমাজকে কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না, তাহার বন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সংসারে অমিশ্রিত ভাল জিনিস প্রায় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষারও আনুসঙ্গিক কুফল আছে। বহুকাল বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিয়া সহসা স্বাধীনতা পাইলে, সে স্বাধীনতার কুব্যবহার অসম্ভব নহে। হিন্দু সমাজে সুরা পান নিষিদ্ধছিল। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা দেখিলেন সুরাপানের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই; তাঁহাদের যাঁহারা আদর্শস্থল সেই ইংরাজেরা সুরাপান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হিন্দু সমাজের মত মানেন না; বৃদ্ধ হিন্দুরা "ওল্ড ফুল", তাহারা কি জানে? তাহারা ত সেক্সপিয়ার মিল্টন পড়ে নাই। ইংরাজ সমাজে পানাহার স্ত্রী পুরুষ একত্রে হইয়া থাকে, পানের মাত্রাধিক্য কতকটা ঘৃণিত। হিন্দু সমাজে "মাৎলাম"র এ প্রতিবন্ধটুকুও নাই। শ্রাদ্ধ বেশীদূর গড়াইল। অনেক কৃতবিদ্যলোক সুরামত্ত হইয়া পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চ শিক্ষায় কোথায় উন্নতি—না অনেকের সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে অধোগতি হইল।

হিন্দু সমাজে অখাদ্য সম্বন্ধে বড়ই কষাকষি ছিল। অখাদ্যের মধ্যে কোন জিনিস এদেশে বাস্তবিক খাওয়া উচিত কিনা, ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা তাহার বিচার করিলেন না। নিজের ধর্ম্ম নিজের মত যাচাই হউক, অন্যে যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, অন্যে যে

মত অবলম্বন করে, তাহার প্রতি কতকটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন মনুষ্যোচিত কার্য্য। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া গরুর হাড় হিন্দুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। দিন কত তাঁহাদের অত্যাচারে বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে আমাদের কতকটা উন্নতি হইয়াছে বলা গিয়াছে। কিন্তু যতটা উন্নতির আশা করা যায় বা বাঞ্ছনীয় তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে অতি অল্পই হইয়াছে। তাহার একটি কারণ, গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে উচ্চ উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করেন না, অতএব ভারতবাসীর মনোবৃত্তির সম্যক্ প্রস্ফুটন হয় না। মুসলমান-সময়ে অনেক অত্যাচার ছিল; কিন্তু উচ্চ পদ সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। সম্রাট প্রবর আকবরের সময়ে ভগবানদাস, মানসিংহ, টোডরমল্ল, রায়সিংহ, বীরবল্ল প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। সম্রাট ফিরোকশাহের সময় রতনচাঁদের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল, একজন মুসলমান ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন যে হিন্দু রতনচাঁদের সম্মতিব্যতীত কোন মুসলমান কাজি হইতে পারিত না। রায় আলমচাঁদ এবং জগৎশেট সুজাখাঁর দুইজন সচিব ছিলেন। জানকী রায় আলিবর্দ্দি খাঁর মুখ্য সচিব ছিলেন। জগদেব গোলকুণ্ডের রাজা ইব্রাহিম খাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ সা'র সময়ে সাম্রাজ্যের ভার হেমু নামক জনৈক হিন্দুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল; হেমু একজন সামান্য দোকানদার হইতে এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ ইতিহাস লেখক এলফিনষ্টোন হেমুর ক্ষমতার অতি তারিফ করিয়াছেন। মোহনলাল, দর্ল্লভ রায় এবং রাম নারায়ণ সিরাজদ্দৌলার তিনজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাট বাবর তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন, যে তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন, রাজস্ব সম্বন্ধে ছোটবড় সকল কার্য্যেই হিন্দুরা নিযুক্ত ছিল। মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস হইতে ভারতবাসীর উচ্চ উচ্চ পদে নিয়োগের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে সামরিক বিভাগের ত কথাই নাই, অন্যান্য বিভাগের যেখানে ভারতবাসীর উচ্চপদে থাকিলে স্বপ্নেও কোন হানির কল্পনা করা যায় না, সেখানেও কোন অত্যুচ্চ পদে তাহাকে দেখা যায় না। যাহাকে শিশুর ন্যায় ব্যবহার করা যায় সে চিরকালই অনেকটা শিশুবৎ থাকে, মানবোচিত উন্নতি তাহার সম্ভবে না! যাহাকে ঘোড়ায় চড়িতে দিবে না, সে কখনও ঘোড়ায় চড়া শিখিবে না। যাহাকে দুরূহ কার্য করিতে দিবে না; সে দুরূহ কার্য করিতে যে উন্নতি হয় তাহাও কখন পাইবে না। কেবল কেরানিগিরি করিয়া জীবনধারণ করিলে উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না। শিক্ষিত যুবকদিগের একশত জনের মধ্যে প্রায় নিরানব্বই জন কেরানিগিরি করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন। তাহাতেও উমেদারি চাই; "লাথিটা আস্‌টা"ও। অতএব অধিকাংশ যুবক যে "মুসড়াইয়া" যায় তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বিলাতী সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি প্রকৃতি-বিজ্ঞান। প্রকৃতিবিজ্ঞানের উন্নতিতেই

পাশ্চাত্য খণ্ডের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান দু হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে অবস্থায় ছিল আজও অনেকটা সেই অবস্থায় আছে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য মহাত্মারা ধর্মনীতি সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞানের উন্নতিতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্যেরা প্রাচীন প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। নানাবিধ কলকারখানা ঐ বিজ্ঞানোন্নতির ফল। পূর্ব্বে যাহা হাতে হইত, এখন তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে কলে হইয়া থাকে। তাই হস্ত নির্মিত শিল্প দ্রব্য কল-নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকিতে পারিতেছে না। ভারতীয় শিল্পের মৃত্যুর ইহাই একটি প্রধান কারণ; উহার পুনর্জীবনের প্রধান আশা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান।

কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ভারতবর্ষে অতি কমই হইয়াছে। বিলাতি সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য বস্তুটি আজও আমরা পাই নাই। যাহা পাইয়াছি তাহার অধিকাংশ ''মেকি''। ভারতবর্ষে অধিকাংশ কল কারখানা ইউরোপীয়দিগের, খনিকার্য্যও প্রায় তাঁহাদের একচেটিয়া। যতদিন এরূপ অবস্থা চলিবে ততদিন আমাদের বিশেষ উন্নতি হইবে না। ততদিন আমাদের দারিদ্রের লাঘব হইবে না। দারিদ্র্য না ঘুচিলে আমাদের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যাহারা উদরের ভাবনায় জ্বালাতন, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক দুইবেলা উদর ভরিয়া খাইতে পায় না, কেরানিগিরি বা কুলিগিরি করিয়া কত অপমান কত কষ্ট সহ্য করিয়া কোনমতে জীবনধারণ করে, তাহাদের পক্ষে সভ্যতা বিড়ম্বনা মাত্র।

অতি আহ্লাদের বিষয় বিজ্ঞান শিক্ষার উপর ক্রমে আমাদের দেশের লোকের চোখ পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কলকারখানাও স্থাপিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতার প্রধান ভিত্তি কি, ক্রমে আমরা দেখিতে পাইতেছি; ক্রমে আমাদের চোখ খুলিতেছে, কিন্তু একটু শীঘ্র শীঘ্র চোখ খুলিলে ভাল হয়। নহিলে যখন চোখ খুলিবে তখন অনেক দিকেই উন্নতির পথ বন্ধ হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে দেশীয় সাহিত্যের অনেক উপকার হইয়াছে। অনেক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে অনেক ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ভাব বা সাহায্য লইয়া দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচিত হইয়াছে। অনুবাদে তত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু শেষোক্ত পুস্তক রচনাতে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। উহাতে উদ্ভাবনী এবং চিন্তাশক্তির আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা বিরল, এবং আরও দুঃখের বিষয় বড় বাড়িতেছে না। পনের বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নতিপথে যেরূপ অগ্রগামী হইতেছিল, এখন সেরূপ হইতেছে না। সম্ভবতঃ, একটি কারণ দেশীয় ভাষায় তত আদর নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উহার প্রবেশ হইলে উন্নতির সম্ভাবনা। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।

হিন্দু সমাজে বিলাতী সভ্যতা ঃ কোন কোন স্থানের অসভ্য জাতিরা প্রভূত পরাক্রমশালী ইউরোপীয়দিগকে দেবতা মনে করিয়াছিল। শক্তিপূজা মনুষ্যের প্রকৃতি। ক্ষমতাবান পুরুষ, বড়লোক, দেবতাবৎ পূজিত হন; জনসাধারণে তাঁহার সবই ভালো দেখেন, মন্দ বিষয়ে অন্ধ। যে জাতি বুদ্ধি এবং বীর্য্যবলে এত বড় একটা দেশকে শাসনে রাখিয়াছে; যে জাতির কীর্ত্তি বসুন্ধরা-ব্যাপী, যাহার সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না, সেই জাতিকে আমাদের মত হীনবল, বিজিত, বর্ত্তমানে অনেক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি যে ভয়, মান্য এবং পূজা করিবে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনেক শিক্ষিত যুবকদিগের নিকট ইংরাজসমাজ আদর্শ সমাজ। অনেক সময়ে ইহা অজানত; প্রকাশ্যে অনেকে ইহা স্বীকার করিবেন না; তথাপি, জানত হউক আর অজানত হউক, ইংরাজের রীতিনীতি আচার ব্যবহার অনেকেই অনুসরণ করিয়া থাকেন। চোখ খুলিয়া অনুসরণ করাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজদিগের নিকট হইতে শিখিবার আমাদের অনেক বিষয় আছে। তবে, আমাদের সমাজের কোন্ রীতিগুলি বাস্তবিক মন্দ, ইংরাজ সমাজের কোন্ রীতিগুলি বাস্তবিক ভাল, এবং আমাদের অবলম্বনীয়, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কার্য্য কবা বিধেয়। অন্ধ অনুকরণ অতিশয় দূষ্য।

ইংরাজ সমাজের সংযোগ এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে, হিন্দু সমাজের কয়েকটি কুনিয়মে বিশেষরূপে আঘাত লাগিয়াছে। ঐ সকল কুনিয়ম হিন্দুসমাজকে এরূপভাবে জড়াইয়াছে, এরূপ কষিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, যে উহাকে বাড়িতে দিতেছে না। উহাদের সমূলে উচ্ছেদ অনেকদিনের কথা। এখন উহাদের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে মাত্র—তাহাও কম লাভ নহে। বর্ণভেদে আমাদের কতকটা উপকার হইয়াছে, সত্য; কিন্তু অনুপকার হইয়াছে অনেক। বর্ণভেদ হিন্দু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে কিন্তু উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। এক্ষণে, বর্ণভেদের আঁটাআঁটি কিছু কমিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধেও নিয়মরক্ষা করিতে বিরত হইয়াছেন। ব্রিটিসরাজ্যে সতীদাহ বন্ধ হইয়াছে। স্বর্গীয বিদ্যাসাগরের উদ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথাগুলি যে মন্দ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। ইংরাজ সমাজের সংযোগে হিন্দুসমাজের এই প্রকার অনেক উপকার হইতেছে।

অনুপকারও হইয়াছে, অন্ধানুকরণ দোষে; যথা, সুরাপানের প্রাদুর্ভাব। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা বুঝি মনে করিলেন, ইংরাজেরা পান করেন, হয়ত পানেই তাঁহাদের বীর্য্য।

ভারতবাসী প্রধানত নিরামিষভোজী, মৎস্য মাংস অতি কমই খাইয়া থাকে। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ খাটনি বাড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মৎস্য মাংস ভক্ষণ বিধেয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

উদ্ভিদে যথেষ্ট পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এবং মাংসে শরীরের হানি হয়, অনেকের এইরূপ মত। সে যাহা হউক, অপরিচিত মাংসভোজনে যে নানা পীড়া জন্মে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অতিরিক্ত মাংস ভক্ষণ দূষণীয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান দেশে। ইউরোপীয়েরা, যাঁহারা বহুকাল হইতে মাংসভোজী, ক্রমে ইহা বুঝিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দুর দুই একটি অখাদ্য খান না। মাংসভোজনেব অত্যাচার হিন্দু সন্তানের স্বাস্থ্যের হানিজনক হইবার সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পবীক্ষা দিতে, পরে মুন্সেফি, মাষ্টারি, ওকালতি, কেরানিগিরি বা অন্যান্য চাকরি করিতে বিশেষরূপে মানসিক পরিশ্রম হয়; কিন্তু তদনুযায়ী শরীর পরিচালনা হয় না। বহুমূত্রাদি যে সকল নূতন রোগের আজকাল এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে উহাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ব্যায়ামচর্চ্চার বিশেষ আদর।

পূর্ব্বকালের লোকদিগের দান এবং অতিথিসৎকার বিশেষ গুণ ছিল। নব্য সম্প্রদায়ে ঐ সকল গুণ তত দেখা যায় না। স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে। তাহার একটি কারণ যেরূপ আয় তাহার তুলনায় ব্যয় অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহার কিছু টাকা হয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেককে প্রতিপালন করিতে হয়। কারণ আমাদের সমাজ অতি দরিদ্র। পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে এখনকার মত কাপড়চোপড়, জুতা, খেল্না, এবং অন্যান্য বিলাতী জিনিসের প্রচলন ছিল না। এখন পরিবারস্থ সকলের এ সকল জিনিস অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যে সকল দূষণীয় প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত দেখা যায়, তাহার নিরাকরণ বাঞ্ছনীয় হইলেও অতি সতর্কতার সহিত আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। ঐ সকল প্রথা অতি প্রাচীন, উহাদের পক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে, ইহা আমাদের মনে বাখা আবশ্যক। আইনের সাহায্যে, ভয় দেখাইয়া, বলপ্রয়োগ করিয়া উহাদের বিনাশ করিতে চেষ্টা করা বিধেয় নহে। অনেক সমাজ আছে যেখানে বাল্য বিবাহ নাই এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত, অথচ উহারা অসভ্য। লেপ্চা প্রভৃতি বহুতর অসভ্য জাতিরা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে; বিধবাবিবাহেও তাহাদের এবং অনেক শূদ্রজাতির কোন আপত্তি নাই। যে সকল সমাজ সংস্কারকেরা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে প্রাচীন সামাজিক প্রথা সকল উঠাইয়া দিতে চান তাঁহারা জানেন না যে, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলেও আকাঙ্খিত ফললাভের আশা বড়ই কম। যে সংস্কার, যে উন্নতি আমরা আপনারা শিক্ষার প্রভাবে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া করিতে পারিব তাহাই স্থায়ী এবং স্বাস্থ্যজনক উন্নতি হইবে।

(ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৮, পৃ: ৪০৪ ও পৃঃ ৪৩২)

হিন্দু ধর্ম্মের নবজীবন

আজকাল হিন্দুধর্ম্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশয় উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের প্রধাননগরে আজ শিক্ষিত সমাজ আগ্রহের সহিত টীকাধারি, অনাবৃত দেহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিতেছেন । যে সমাজকে টাউন হলে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সুবক্তার ইংরাজি বক্তৃতা টলাইতে পারে নাই, আজ সেই সমাজকে অশ্রুতপূর্ব্ব স্থানে অশ্রুতপূর্ব্ব লোকের বাঙ্গালা বক্তৃতা মাতাইয়া তুলিল। যে সকল ব্রতনিষ্ঠাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকটা কুসংস্কার বলিয়া সুপরিচিত ছিল, আজ তাহা সম্মানিত হইতেছে, আজ তৎপরিপোষক তর্ক সাদরে গৃহীত হইতেছে।

এই নবানুরাগের প্রধান কারণ, হিন্দুধর্ম- জাতীয় ধর্ম্ম। আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, "সমুদয় ভারতবাসী এক জাতি" ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিজাতীয় ধর্ম্ম, বিজাতীয় রীতিনীতির উপর বিরাগ, এবং জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় আচার ব্যবহারের উপর অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবজীবন প্রভাতের মূলীভূত কারণ তাহা কোন্ অপক্ষপাতী বিচারক অস্বীকার করিবেন? সত্য বটে আর্য্যেরা সভ্যতা সোপানের অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বহুকালের কথা। তাঁহাদের উন্নতি সূর্য্য অনেকদিন অস্তমিত হইয়াছে। গত সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অমাবস্যা রজনী। গত সহস্র বৎসর হিন্দুরা নিদ্রিত ছিল। আমাদের গণিত শাস্ত্র, দর্শনাদি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে ছিল, আজও সেইখানে রহিয়াছে একটুও অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে (বিশেষত গত দুই শত বৎসরে) পাশ্চাত্য জাতিরা প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিবর্ত্তে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আমাদের অপমান নাই, তাহারা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিলে আমাদের গৌরবের হ্রাস হইবে না। প্রাচীন মিসর গ্রীসের গুরু, কিন্তু কালে সভ্যতায় শিষ্যের কাছে গুরুর হার মানিতে হইল। গণিত বিদ্যা এবং রসায়ন আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট শেখে , আরবদিগের কাছে বর্ত্তমান ইউরোপীয়রা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু আমাদের গণিত ও রসায়নের সহিত অধুনাতন ইউরোপীয় গণিত ও রসায়নের কত প্রভেদ, তাহা পাঠককে বলার প্রয়োজন নাই।

প্রভেদ স্বীকার করায় কোন অপমান দেখা যায় না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে আমাদের যাহা কিছু জীবনে লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা যে অনেকটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রমাণ, যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায় নাই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব যাহাদের মনে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মধ্যে নবজীবনের চিহ্ন অতি অল্পই দৃষ্ট হয়— তাহারা পূর্ব্বেও যেরুপ মৃতবৎ ছিল, এখনও সেইরুপ মৃতবৎ।

পাশ্চাত্য খণ্ডে যে বিজ্ঞান দ্রুতগতি উন্নতিপথে ধাবমান হইতেছে, যে বিজ্ঞানের বলে আমাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, যাহা কিছু সেই বিজ্ঞানের প্রতিকূল তাহার পতন নিশ্চয়, যাহা কিছু উহার অনুকূল তাহাই রহিবে। খ্রীষ্টানধর্ম বিনাশোন্মুখ; ফ্রান্স, জার্ম্মান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে অখ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ খ্রীষ্টানধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রতিকূল। ধর্ম্ম দ্বারা সচরাচর যাহা বুঝায়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুধর্মের সহিত বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নাই। বিশ্বাস সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের উদারতা সম্পূর্ণ। তুমি এক ঈশ্বরেব উপাসনা করিবে, হিন্দুধর্ম্ম তোমার ক্রোড়ে লইবে। তুমি প্রতিমা পূজা করিবে, যেরুপ খুসী এবং যত খুসী প্রতিমা গড়িয়া পূজা কর, হিন্দুধর্ম্ম কখনও তোমায় বারণ করিবে না। হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, তাই উন্নতিশীল, তাই বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 'প্রাচীন এপিকিউরস, ডিমক্রিটস হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ প্রধানেরা যে মহাশক্তির উপাসক ('নবজীবন', পৌষ, ৬ সংখ্যা, ৩৬৪ পৃঃ) সেই জগৎ প্রসূতি মহাদেবীর আরাধনা করিতে যে ধর্ম্ম উপদেশ দেয়, যে ধর্ম্মে বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে গণ্য, যে ধর্ম্ম চার্ব্বাকাদি নিরীশ্বরবাদিদিগকেও আশ্রয় দেয়, সে ধর্ম্মের বিনাশ অসম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীবিদ্যার মূলসূত্র, জীবের ক্রমবিকাশ। ইহা প্রচারিত হইবা মাত্র খ্রীষ্টান ধর্ম্ম খড়গ হস্ত হইল; প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম জীবের ক্রমবিকাশ মত সাদরে গ্রহণ করিল, এমনকি কোন কোন পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রে ঐ মতের অস্ফুট প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর বয়স পরিমিত নহে, যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এই অখণ্ডনীয় সত্য খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে এই সত্য পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সমাজের সহিত অতিশয় জড়াইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়ম ধর্ম্মের নামে প্রচলিত। সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিবে না, ধর্ম্মচ্যুত হইবে। ঐ সকল নিয়মের সহিত ধর্ম্মের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধে নাই, উহাদের নাশে প্রকৃত ধর্ম্মের নাশ হইবে না। যদি উহাদের কোনটি উন্নতি বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজের পরিবর্তন হইবে

সত্য, কিন্তু পরিবর্তন উন্নতির সহচর। যাহা কিছু স্থায়ী তাহার উন্নতি অসম্ভব। প্রাণীজগতের ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইয়া অপকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সমগ্র জীবজগৎ যে নিয়মের বশবর্ত্তী, সমাজ বিশেষের পক্ষে সে নিয়ম অতিক্রম করা অসম্ভব। পরিবর্ত্তনশীল না হইলে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায়, সমাজেরও উন্নতি সম্ভবে না।

আমরা যে সকল সামাজিক নিয়মের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিলাম, এই প্রবন্ধে তাহার প্রধান কয়টির অবতারণা করিব।

১) খাদ্যাখাদ্য বিচার। এই নিয়মটি কোন ক্রমেই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে। এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাহা অখাদ্য বলিয়া মত দিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, তাঁহাদের ধর্ম্মের নেতারা, তাহা খাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্য্যেরা যে গোমাংস পর্য্যন্ত ছাড়িতেন না তাহার প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ পর্যন্ত পাইয়াছেন। আবার আজকালকার হিন্দুদিগের মধ্যেই, বঙ্গদেশে যাহা অখাদ্য, মহারাষ্ট্রে তাহা খাদ্য, মহারাষ্ট্রে যাহা অখাদ্য, বঙ্গদেশে তাহা খাদ্য। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মৎস্য এবং ছাগশাবকের জন্য লালায়িত। মহারাষ্ট্রীয় শূদ্র এবং অনেক রাজপুত নির্ব্বিবাদে গ্রাম্য কুক্কুটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, বঙ্গীয় শূদ্রের পক্ষে ভিন্ন নিয়ম। ফলত প্রতিমাদি পূজা সম্বন্ধে যেরূপ, খাদ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের আদেশ অলঙঘনীয় নহে, স্বেচ্ছাপালনীয়। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা যেরূপ দুর্গা পূজা না করিয়াও হিন্দু, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা সেইরূপ মৎস্য মাংস খাইয়াও হিন্দু। যদি মৎস্যাদি ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বাস্তবিক নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নামের অধিকারী হইতে পারিতেন না। অতএব দেখা যাইতেছে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ সামাজিক নিয়মমাত্র। ধর্ম্মের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। যদি থাকে তাহা হইলে থাকা উচিত নহে। মৎস্য মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, উহা ব্যতীত শারীরিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে এখানে তর্ক বিতর্ক করার প্রয়োজন করে না। তবে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্ম্মের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার বিজ্ঞান করিবে; বিজ্ঞানের মতানুসারেও চলা না চলা আমাদের ইচ্ছাধীন,-"আপরুচি খানা"। মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত হইলেও, অনেক করুণ হৃদয় লোক উহাতে বিরত থাকিতে পারেন; মাংস সাধারণত নিষিদ্ধ হইলেও, কাহারও কাহারও পক্ষে, উহা হইতে উপকার অসম্ভব নহে, এবং কখনও কখনও উহা ব্যতীত আর কোন খাদ্য না জুটিতেও পারে।

প্রকৃতপক্ষে, আজকাল নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের খাদ্য বিচার সম্বন্ধের নিয়ম সহস্রাধিক বার লঙঘন করিতেছে। কৈ, তাহারা ত ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে না, যে হিন্দু সেই হিন্দু রহিতেছে! তবে তোমার হিন্দু ধর্ম্মের আদেশ কোথায় রহিল?

নব্য সম্প্রদায় ঐ আদেশ কেন মানে না? কারণ, উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ উহাব প্রতিপালনে ব্যক্তিগত বা সমাজগত উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলিবেন, নব্য সম্প্রদায় অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা "অজ্ঞানত, গোপনে"। যাহা অকর্ত্তব্য তাহা কি গোপনে করিলে কোন দোষ হয় না? গোপনই বা কোথায়? অনেকে প্রকাশ্যরূপেই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অনেক অখাদ্য উদরস্থ করেন। কিন্তু অনেক সময়ে যে অনেককে কপটাচরণ করিতে হয়, মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তাহা কে না জানে ? (অনেকে বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন, যে সমাজের শৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য, কি বৃদ্ধ পিতা মাতার মনস্তুষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা কথা বলায় বা কপটাচরণ করায় দোষ নাই। তাঁহাদের প্রতি সংক্ষেপে উত্তর-তাঁহারা ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করুন)। এ পাপের জন্য কি হিন্দু সমাজ কতকটা দায়ী নহে? যে আজ্ঞার ক্রমাগত লঙঘন হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও লঙঘন হইবে, যে আজ্ঞার লঙঘনকারীদিগকে সমাজ দণ্ড দিতে অসমর্থ অথচ যে আজ্ঞা থাকা প্রযুক্ত অনেকের মন পাপে কলুষিত হইতেছে, সে আজ্ঞার অবহেলা বর্ত্তমান ঘটনা পরম্পরায় অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বজায় রাখিতে আজ্ঞা রক্ষা করা কি বিধেয়? চেষ্টা করা কি বাতুলের কার্য্য নহে? অতএব আমরা যত শীঘ্র আমাদের ধর্ম্মের খাদ্য অখাদ্য সম্বন্ধে নিয়ম উঠাইয়া দেই ততই আমাদের ধর্ম্মের এবং সমাজের পক্ষে ভাল।

২) পোতারোহণে বিদেশ গমন। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে বাস্তবিক নিষিদ্ধ কি না তাহা লেখক বিশেষরূপে অবগত নহেন। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া ইউরোপে যাইলে "জাত যায়" তাহা সকলেই জানেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে "জাত যায়" জাহাজারোহণের জন্য নহে, 'জাত যায়' অখাদ্য ভক্ষণের জন্য। তাহা যদি হয়, তবে ঠিক ঐ সকল অখাদ্য যাহারা এই দেশেই প্রকাশ্যেই হউক আর অপ্রকাশ্যেই হউক খাইয়া থাকেন, তাহাদের জাত যায় না কেন? এ সমস্যা কে পূরণ করিবে? কয়েকজন হিন্দু সমাজভুক্ত হিন্দু (তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপবীতধারী) পি এন্ড ও কোম্পানির জাহাজে-জাহাজের টেবিলে, জাহাজের খাদ্য খাইয়া —মান্দ্রাজ বা লঙ্কাদ্বীপ যাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের "জাত" গেল না। অতএব দেখা যাইতেছে যে হিন্দু ধর্ম্মের আদেশ যাহাই হউক, জাহাজে করিয়া ইউরোপ যাওয়া হিন্দু সমাজের চক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সাপেক্ষ পাপ! এরূপ বিবেকহীন সংকীর্ণ নিয়ম যে প্রাচীন উন্নতিশীল হিন্দুদিগের ধর্ম্মে ছিল না, তাহার প্রমাণ তাঁহারা বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন। এরূপ নিয়ম যে আমাদের উন্নতির বিরোধী, তাহা পাঠককে অধিক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার বুদ্ধির অপমান করা হইবে। ভারতবর্ষ ছাড়া যে অন্য দেশ আছে, হিন্দু ছাড়া যে অন্য সভ্য জাতি আছে, অনেকের পক্ষে তাহা জানা আবশ্যক। বিদেশ ভ্রমণে যে মনের সঙ্কীর্ণতা যায় এবং শিক্ষালাভ হয়, তাহা সকলেরই

জানা অছে। পাশচাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট এখনও বহুদিন আমাদিগকে নতশির হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ইউরোপে যে বিজ্ঞান সূর্য্য উদিত হইয়াছে, এখানে যাহার ঈষৎ আভা পাইয়া আমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইউরোপে না যাইলে তাহার জ্যোতির সম্পর্ক উপলব্ধি অসম্ভব। আবার "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।" ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিস্তার যে বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয় তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু যতদিন পোতারোহণে ইউরোপ ও আমেরিকা গমন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা ইচ্ছানুরূপ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না, ততদিন ভারতবর্ষ গরীব থাকিবে। চারিদিকে শুনা যায়, আমাদের দেশে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যন্ত্রাদি সম্বন্ধেশিক্ষা কে দিবে, কোথায় পাইবে? তাহার জন্য কি ইউরোপে যাওয়া আবশ্যক নহে? জনৈক লব্ধ প্রতিষ্ঠ ধনাঢ্য হিন্দু বণিক কার্য্যবশত ইংলণ্ডে যান। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার কি লিবরপুলে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে অতি গোপনে লণ্ডন দেখিতে যান —পাছে কোন বাঙ্গালিব চক্ষে পড়েন। এখানে প্রচার ছিল যে তিনি বোম্বাই গিয়াছেন। তাঁকে এরূ প নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল কেন? লেখক তাঁহার বিষয় যতদূর শুনিয়াছেন তিনি একজন গণ্য, মান্য, উৎকৃষ্ট লোক, সহজে মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন। বোধ হয়, হিন্দু সমাজের কুনিয়মই তাঁহাকে কুপথে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল।

৩) বর্ণভেদ। বর্ণভেদের মূল হিন্দু সমাজে এমনি দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, এবং এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, উহাকে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্য। অনেকদিন হইতে অনেক সমাজ সংস্কারক বর্ণ ভেদের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি উহা সতেজ রহিয়াছে। বোধ হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ, তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। না। নূতন নাম ধরিয়া, নূতন দল বাঁধিয়া, হিন্দু সমাজের এই চারাটি ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে না। ডাল গজাইল; নূতন গাছ হইল; জাতির সংখ্যা বাড়িল মাত্র - হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ যে সেই রহিল। কালে আরও বদ্ধমূল হইল। মিথ্যাকে সত্য করিতে চেষ্টা না করিয়া, কপটাচারণ না করিয়া যথাসাধ্য হিন্দু সমাজের ভিতর থাকিয়া বর্ণ ভেদের মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত কর, কালে উৎপাটিত হইবেই হইবে।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় অনেক স্থানে অনার্য্যদিগকে পরাজয় করেন। আর্য্যেরা বিজেতা অনার্য্যেরা বিজিত, আর্য্যেরা সভ্য, অনার্য্যেরা অসভ্য; আর্য্যেরা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, অনার্য্যেরা কৃষ্ণবর্ণ কদাকার। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে, এবং অদ্যাপি ঘটিতেছে ভারতবর্ষেও তাহা ঘটিয়াছিল, আর্য্যে অনার্য্যে বর্ণভেদ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন? এখন আর্য্য অনার্য্য সকলেই বিজিত, পদানত। এখন এক নূতন গৌরবর্ণ, প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতি হইতে, কি আর্য্য কি অনার্য্য সমুদয় ভারত সন্তান ভিন্ন বর্ণ। এখন আর

আমরা কি বলিয়া বর্ণভেদ বজায় রাখি? সমুদয় ফ্রান্সবাসী যেরূপ একজাতি, ইংল্যান্ডবাসী যেরূপ একজাতি, আমরা যদি সেইরূপ একজাতি হইতে চাই, তাহা হইলে বর্ণভেদ বক্ষা করিলে চলিবে না। সমুদয় ভারতবাসী একজাতি, সমুদয় ভারতবর্ষ আমাদের দেশ -- ইহা নূতন এবং মহৎ ভাব। এখন আর ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, শূদ্রে শূদ্রে, ব্রাহ্মণে শূদ্রে, বঙ্গে মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে পাঞ্জাবে, আসামে, বর্ণভেদ জনিত সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ থাকা কি অসঙ্গত নহে? শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু নবজীবনে মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে যথার্থ ব্রাহ্মণ গুণে, জন্মে নহে--- গুণবান শূদ্র ব্রাহ্মণ, নির্গুণ ব্রাহ্মণ শূদ্র। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্র বংশ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে না হয়, তাহারাই শূদ্র।" ("নবজীবন", মাঘ, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।) অতএব আমাদের প্রস্তাব ধর্মবিরুদ্ধ নহে-বরঞ্চ ধর্ম সঙ্গত।

বর্ণভেদ থাকা প্রযুক্ত যে কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে, এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। বর্ণভেদ সত্ত্বে — হিন্দুর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ এক প্রকার অসম্ভব। মনে কর, কেহ ইউরোপ যাইবে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বর্ণের বা সবর্ণের পাচক সঙ্গে লইতে হইবে। পাচক লইবার সঙ্গতি নাই, সে কি করিবে? পাচক লইলেও অনেকস্থানে হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে রন্ধন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বর্ণভেদ থাকিতে হিন্দু ধর্ম্মের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণেচ্ছুক হয়, হিন্দু ধর্ম্ম কেন না তাহাকে আশ্রয় দিবে? প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের শাখামাত্র, বৌদ্ধদিগকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধর্ম্মের কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ লাভেরই সম্ভাবনা।

জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজকাল কয়জন শিক্ষিত হিন্দু ম্লেচ্ছ-স্পর্শে পাপ মনে করেন? আজকাল শিক্ষিত হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ শূদ্রের আকাশ পাতাল প্রভেদ কি ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে না? নব্য সম্প্রদায়ের কয়জন; নিকৃষ্ট বর্ণীয় পাচক প্রস্তুত খাদ্য (বা হিন্দু ধর্ম্মের নিষিদ্ধ খাদ্য) উদরস্থ করা পাপ মনে করেন।

৪) বিধবা বিবাহ নিষেধ। বিধবা বিবাহ যে হিন্দু ধর্ম্মে নিষিদ্ধ নহে তাহা মান্যবর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্পষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন। তবে কেন হিন্দু সমাজ বিধবাবিবাহের বিরূদ্ধে খড়্গ হস্ত? অনেক পতিব্রতা সাধ্বী বিধবার মনে দ্বিতীয়বার বিবাহের ভাব হয়ত কখনও উদিত হইবে না। তাঁহারা পতিব্রতার আদর্শ; হিন্দুগৃহ উজ্জ্বল করিতে থাকুন। কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ থাকিবে তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

৫) বাল্য বিবাহ। ইহা যে মোটের উপর কুফলপ্রদ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেকেই এ বিষয়ে ভুক্ত ভোগী --অতএব অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

যে রূপ প্রাচীরস্থ তরুলতা প্রাচীন অট্টালিকার অংশ হইলেও, উহাব পক্ষে হানিজনক, সেইরূপ উপরোক্ত সামাজিক নিয়ম সমূহ এখন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও উহার শত্রু। ঐ সকলে নিয়মের উচ্ছেদে হিন্দুধর্ম্মের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। ফলত হিন্দুধর্ম্মের স্থায়িত্বের জন্য উহাদের বিনাশ অত্যাবশ্যক।

সমাজবদ্ধ হইলেই মনুষ্যকে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অনেক বিষয়ে সমাজের অধীন হইতে হয়, ইহা জানা কথা। অনেকে ইহার বিকৃত অর্থ কবিয়া সমাজে যে কোন নিয়ম প্রচলিত থাকে, ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার চিরস্থায়িত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আমরা যে সকল নিয়মের উল্লেখ করিলাম, বিচার সঙ্গত হউক আর না হউক, উন্নতি বিরূদ্ধ হউক আর না হউক, হিন্দু সমাজের সভ্যদিগের পক্ষে ইহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। কারণ ঐ সকল নিয়ম অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; না মানলে সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। যাহারা এরূপ মত প্রকাশ করেন এবং বাস্তবিক তদনুযাযী কার্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষু আর একটু উন্মীলিত হওয়া আবশ্যক। বস্তুত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই উল্লিখিত নিয়ম সমূহের উপর আন্তরিক আস্থা আদৌ নাই। অন্তত কখন কখন, তাঁহাদিগের উহার কোন কোনটির প্রতিকূলচারী হইতে দেখা যায। সে যাহা হউক, উল্লিখিত নিয়ম সমূহ প্রতিপালনে বিরত হইলে, সমাজে যে কি বিশৃঙ্খলতা, কি ঘোর বিপদ ঘটিবে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অসমর্থ। মনে কর কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ হৃদয়ের বন্ধু কোন শূদ্রের সহিত এক সঙ্গে আহার করিলেন, তাহাতে সমাজের কি হানি হইল? মনে কর কোন পিতা তাহার অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন — তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? মনে কর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাইলেন, নিষিদ্ধ খাদ্য লইলেন, বর্ণভেদের বন্ধন ছিঁড়িলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের সমাজের এবং দেশের উপকারের না অপকারের সম্ভাবনা? স্বীকার করি যে ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইলে — তাহার এখনও অনেক বিলম্ব — আইন লইয়া একটু গোল হইতে পারে। কিন্তু, আইন সমাজের জন্য না সমাজ আইনের জন্য? সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্ত্তন হইবে।

হিতকারি উন্নতিশীল পরিবর্ত্তনে যদি বিশৃঙ্খলতা হয়, তাহা হইলে সেরূপ বিশৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। সেরূপ বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত ব্যক্তিগত বা সমাজগত উন্নতি সাধিত হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া অনেক খ্রীষ্টানের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে ; বাল্যকালে যে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, তাহাতে বিষম আঘাত লাগে, মন বিচলিত হয়----তবে কি সে বিজ্ঞান পাঠ বন্ধ করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রযুক্ত

আমাদের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে। সমাজের যে সকল প্রথা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং হানিজনক বলিয়া প্রতীতি হয়, তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি থাকে না—তবে কি আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে হইবে? তাহা হইলেই সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

বলা বাহুল্য, যে যে পরিবর্ত্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলম্বনীয়। সমাজের যে সকল প্রথা স্পষ্টরূপে ধর্ম্মবিরোধী, নীতিবিরোধী বা হানিজনক নহে, সেগুলি যেন আমরা রক্ষা করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও ফলিতেছে। সুফলের গাছগুলিরই আমরা যত্ন করিব। কতকগুলি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে, তন্মধ্যে যে যে বৃক্ষের ফল মিষ্ট কেবল তাহাই রক্ষণীয়।

ভারতবর্ষের নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। ভাল চিহ্ন, আনন্দের বিষয়। কিন্তু যেন আমাদের স্মরণ থাকে, যে নবীন উৎসাহ, নূতন প্রেম, নবানুরাগ, সচরাচর প্রবল হইলেও সকল সময়ে স্থায়ী হয় না। হিন্দুধর্ম্মের উপর নব্যবঙ্গের যে অনুরাগ, যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহার স্থায়িত্ব যদি আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মকে সমাজ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন করা অত্যাবশ্যক। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত হিন্দু সমাজের বর্তমান সম্বন্ধ অধিক দিন থাকিবে না। — থাকিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম যতই কেন উদার হউক না, বিশ্বাস সম্বন্ধে যতই কেন প্রশস্ত হউক না, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের যতই কেন সামঞ্জস্য থাকুক না, যতদিন ইহা অবনতিগ্রস্ত, অদূরদর্শী সঙ্কীর্ণমনা, সমাজের দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ইহা নবজীবন পাইবে না।

(নবজীবন, ১ম ভাগ, ফাল্গুন ১২৯১ , ৮ম সংখ্যা)

তৃতীয় অধ্যায়

গোঁড় গীত

উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে গোদাববী নদী পর্য্যন্ত গোঁড়দেশ বিস্তৃত। হোসঙ্গাবাদ, জব্বলপুব, মাণ্ডলা, রাইপুর প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের প্রায সমুদয় জেলাতেই গোঁড়ের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। নাগপুরের প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচারক হিস্‌লপ গোঁড়দের কতকগুলি গীত সংগ্রহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিশনর, রিচার্ড টেম্পল (এক্ষণে সার রিচার্ড টেম্পল) ঐ সকল গীত ইংরাজী অনুবাদ- সহ প্রকাশ করেন। নিম্নে ইহার (অনেক বাদ সাদ্ দিয়া) বাঙ্গালা অনুবাদ করা গেল; স্থানে স্থানে কেবল ভাবার্থ লওযা হইয়াছে। গীতগুলি গোঁড় সমাজের ক্রমবিকাশ অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, তজ্জন্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পঠিতব্য। কিন্তু তা ছাড়া উহাতে মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্ব লক্ষিত হয়। গীত কয়টির বর্ত্তমান পরিচ্ছদে হিন্দুদের হাত দেখা যায়। কিন্তু গীতগুলিব আসল গঠন যে গোঁড়ী তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথম ভাগ

গোঁড়ের কারাবাস

জনমিয়া গোঁড় বনে ছড়ায়ে পড়িল,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ কিম্বা নিম্ন উপত্যকা,
গোঁড় নাই হেন ঠাঁই দেখা নাহি যায়।
যা কিছু দেখিতে পায় তাই খাদ্য তার;
হরিণ, শৃগাল, ভেক, মহিষ, শূকর,
ষাঁড়, গরু, আরসোলা, কিম্বা গিরগিটা
নাহি কোন মানবিচ সব ধরে খায়।*
ছয় মাস ধরে গোঁড় স্নান নাহি করে,
মুখ নাহি ধোয কভু; গোবরের পব
স্বচ্ছন্দে শুইয়া রহে;+ ছিল এইরূপ
গোঁড় সৃষ্টির প্রথমে; পূবিল অনিল
দর্গন্ধে ধবলগিরি শিবের আবাস।
ক্রোধান্ধ ধূর্জ্জটী বলে ডাকি নারায়ণে;
—"কলুষিত সব স্থান করিলেক গোঁড়;
ধ্বংসিব তাহার বংশ প্রতিজ্ঞা আমার।
এহেন ধবলগিরি, বাসস্থান মোর,

---

* জঙ্গলের গোঁড়েরা অদ্যাপি এরূপ খাইয়া থাকে।
+ নিতান্ত অসভ্য গোঁড়ের পক্ষে এ চিত্রটি এখনও অযথার্থ নহে।

পূরিত দুর্গন্ধে এবে; আন হেথা গোঁড়।"
দলে দলে গোঁড় তবে হইল আনীত,
লয়ে তাহাদিগকে নিম্নে, উপত্যকা মাঝে,
সারি সারি করি শিব বসায়ে সবারে,
নিরমিয়া এক কাঠবিড়ালি তখন,
জীবিত করিয়া তারে দিলেন ছাড়িয়া।
খাড়া করি লেজ কাঠবিড়ালি দৌড়ায়,
দেখি তারে গোঁড় সব উঠিল দাঁড়ায়ে;
ধায় পিছে পিছে তার, কেহ বলে "মার",
কেহ বলে "ধর। খেতে বড় মজা হবে।"
আহরিল যষ্টি কেহ, কেহ বা পাথর;
দৌড়ে দ্রুতবেগে সবে; লম্বা লম্বা চুল
উড়িল আকাশে।* ছিল কারাগার এক
শিবের, প্রবেশে কাঠবিড়ালি তথায়;
প্রবেশি তাহার সনে যত গোঁড় দল,
চারি জন ছাড়া সবে বন্দী হলো তথা।
প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড কারাগার মুখে
স্থাপিলেন শিব, ভস্মাসর নামে দৈত্য
প্রহরীর কার্য্যে তথা হলো নিয়োজিত।
হেন কালে নিদ্রা হতে উঠিয়া পার্ব্বতী
ভাবিলেন, "কতদিন হলো আমি দেখি
নাই গোড়, কোথা গেল, হায়, তারা সবে?
আছিল ধবলাগিরি কোলাহলপর্ণ,
স্তব্ধ চারিদিক আজ, নাহি সাড়া শব্দ।"
বলিলেন মহাদেবে, "গোঁড় মোর নাহি
আসে, কোথা গেল তারা? বল শূলপাণি।
"অসহ্য দুর্গন্ধে পূর্ণ হলো মম গিরি,
বন্দী তাই তাহাদিগে করিয়াছি, কিন্তু
পলায়েছে চারিজন," উত্তরিল শিব।
অই চারি গোঁড় ঘুরি জঙ্গলে জঙ্গলে
উত্তরিল "কাচিকোপালাহুগড়" স্থানে।
সন্ধান তাদের নাহি পাইয়া পার্ব্বতী,
আরম্ভিল তপঃ গোঁড় তরিবার তরে।
অন্তর্যামী ভগবান জানিলেন সব,
বলিলেন নারায়ণে, "বল পার্ব্বতীরে,
রক্ষিবারে গোঁড় আমি করিব উপায়।"

দ্বিতীয় ভাগ
লিঙ্গোর জন্ম ও মৃত্যু

উদ্ধারিতে গোঁড়ে তবে দেব ভগবান
লিঙ্গোরে দিলেন জন্ম। পঁহুছিল লিঙ্গো
যথায় পলায়ে ছিল গোঁড় চারিজন।
এনেছিল জন্তু যাহা শীকার করিয়া,
খেতে ছিল তারা তাহা কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ।
নিরখি লিঙ্গোকে তারা বলিতে লাগিল,
—"আছি মোরা চারি ভাই, পাইব পঞ্চম,
ডাকিয়া অনিব মোরা উহাকে হেথায়।"
শিখাইল লিঙ্গো চাস গোঁড় চারিজনে।
কাটি গাছপালা, মাঠ করি পরিষ্কার
বেড়িল তাহার, রাখি দ্বার একদিকে;
রোপিলেক ধান্য তবে লিঙ্গো সেইখানে।
দেখিয়া লিঙ্গোর কীর্ত্তি অবাক তাহারা!**

---

* শিকারে গোঁড়দের উৎসাহ এখানে বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

** গোঁড়েরা অন্যান্য জাতির ন্যায় প্রথমাবস্থায় কেবল শীকার করিয়া প্রাণধারণ করিত, পরে চাস শিখে; এই সঙ্গীত দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সে চাসও আমাদের দেশের চাসের ন্যায় নহে। তাহাতে লাঙ্গলের প্রয়োজন নাই, বলদ বা মহিষের প্রয়োজন নাই। উচ্চ ঢালুস্থানে জঙ্গল কাটিয়া মাঠ প্রস্তুত করে; সেখানে কর্ত্তিত বৃক্ষ গুল্মাদি জ্বালাইযা দেয়, মাঠ ছাই দ্বারা আবৃত হয়; পরে উহার উচ্চতম স্থানে বর্ষার প্রারম্ভে বীজ বপন করে। ঐ বীজ বৃষ্টির জলে মাঠময় ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে শস্যোৎপন্ন হয়। এই রকমের চাসকে "ডাহি" বলে। জঙ্গলের গোঁড় এবং অন্যান্য অনেক অসভ্য জাতি অদ্যাপি "ডাহি" করিয়া থাকে। তাহাতে খরচ নাই বলিলেও হয়।

একদা রাত্রিতে তারা বহু চেষ্টা করি
চকমকি হতে নারে আগুন করিতে।
বলিলেন তবে লিঙ্গো গোঁড় চারিজনে,
"তিন ক্রোশ দূরে থাকে রিকন্দ রাক্ষস,
আছে অগ্নি মাঠে তার। আন সেথা হতে।
দেখি ধূম দূর হতে চিনিবে সে স্থান।"
এ বলে উহারে "আমি যাব না সেথায়",
বয়সে সবার ছোট ছিল যেই জন,
সেই তবে অবশেষে চলিল সেখানে।
জ্বলিছে তথায় অগ্নি উচ্চে ধূ ধূ করে;
বড় বড় শাল, আর, মহুয়া, আঞ্জন,
মোটা মোটা গুঁড়ি তার জ্বলিছে প্রবল।
পাইয়া তাহার তাপ, হৃদয়ের সুখে
গভীর নিদ্রায় মগ্ন রিকন্দ রাক্ষস।*
ভয়ে জড়সড় গোঁড় কাঁপে থরথর;
ভাবিতে লাগিল, "পড়ি যদি রাক্ষসের
চোখে, নাহিক নিস্তার, নিশ্চয় মরণ।"
চুপি চুপি গিয়া তবে আগুনের কাছে
উঠাইল গুঁড়ী এক-পড়িল স্ফুলিঙ্গ
বৃদ্ধ রাক্ষসের পায়, দহিল সে স্থান।
তাড়াতাড়ি ঝাড়া দিয়া উঠিল রাক্ষস
বলিলেক "গোঁড় ক্ষুধা লাগিয়াছে মোর,
কচি সশা মত তুই এসেছিস হেথা।"
উর্দ্ধশ্বাসে গোঁড় তবে যায় পলাইয়া,
ফেলিয়া পশ্চাতে গুঁড়ি লয়েছিল যাহা,
নাহি থামে, নাহি চায় পিছে একবার;
অবশেষে প্রাণে প্রাণে আসিয়া স্ববাসে,
বলিতে লাগিল সবে হাঁপাতে হাঁপাতে,
"গিযাছিন অগ্নিতরে, দেখিনু প্রকাণ্ড
এক রাক্ষস তথায়, পলাইয়া তবে
কোনমতে বেঁচে ফিরে এসেছি হেথায়।"**
এত শুনি লিঙ্গো নিজে চলিল তথায়,
লইয়া কমড়াখোলা, বংশখণ্ড আর,
ছিঁড়ি কেশ শির হতে, সারঙ্গের ন্যায়
বাদ্য যন্ত্র এক লিঙ্গো করি নিরমাণ,
ধনুক প্রস্তুতি তবে, বাজাইল তায়,
বড় খুসি মনে লিঙ্গো; করে করি তাহা
রাক্ষসের ক্ষেত্রে আসি হলো উপনীত।
লম্বিত রিকন্দ তথা আগুনের পাশে
প্রকাণ্ড গুড়িব ন্যায়, বিকট দশন,
হাঁ করিয়া নিদ্রা যায়, মুদিত নয়ন,
আছিল অশ্বত্থ এক মাঠের নিকট,
চড়িল তাহাতে লিঙ্গো, হইল প্রভাত,
সাবঙ্গ লইয়া লিঙ্গো ঘা দিল তাহায,
শতরাগ তাহা হতে হইল বাহির,
তাহাব সঙ্গীতে স্তব্ধ পাহাড় জঙ্গল,
সে মধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশে রক্ষের।
ঝটিতি উঠিয়া বসে বিকন্দ রাক্ষস,
তুলিল উপরে চোখ, এদিক ওদিক
নিরখিল চারিদিক, আসিছে সঙ্গীত
কোথা হতে, স্থির তাহা না পারে কবিতে।
বলিল রাক্ষস, "কোন্ জীব কোথা হতে
আসিয়াছে আজি, ময়নার মত গীত
মধুর গাইয়া, হরি লয় মন মোর।"
এদিক ওদিক ধায়, দেখে চারিদিকে,
না পায় দেখিতে কিছু, কভু বসিতেছে,
দাঁড়াইছে কভু, লম্ফ দিতেছে কভু বা,
গড়াগড়ি যায় কভু, আরম্ভিল নৃত্য।
রাক্ষসী*** প্রভাতে আসি ঘরের বাহির,
শুনিল মাঠের দিকে মধুর সঙ্গীত।
আসিয়া তথায় তার স্বামীরে ডাকিল;
ঘন ঘন তুলি পদ প্রসারিয়া বাহু,

* গোঁড় প্রভৃতি জাতিরা এইরূপ আগুন জ্বালাইয়া তাহার পাশে শুইয়া মাঠ চৌকি দেয়।
** গোঁড়, ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা অত্যন্ত ভীরু।
*** রাক্ষসী মাঠ হইতে কিছু দূরে ঘরে শুইয়াছিল।

নোয়াইয়া ঘাড়, নৃত্যে মগন রাক্ষস,
হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য; দেখিযা তাহারে
উচ্চে ডাকিল রাক্ষসী-"ওবে মিন্‌ষে মোর,
বড়ই মধুর অই সঙ্গীত, রে বুড়ো,
কেড়ে লয় মন প্রাণ, আমিও নাচিব।"
এত বলি আবম্ভিল নাচিতে রাক্ষসী।*
নীরবিল বীণা, গীত থামিল লিঙ্গোব;
সম্ভাষিল উচ্চে লিঙ্গো রিকন্দ রাক্ষসে।
বলিল বিকন্দ, "ভাল প্রতারিত তুমি করেছ
মোদিগে, এস, দেও আলিঙ্গন।"
আলিঙ্গিয়া বৃদ্ধে লিঙ্গো সাদরে বলিল,
"নমি আমি খুড়া তোমা।" হাত ধবাধরি
বসিল উভয়ে তবে আগুনের পাশে।
জিজ্ঞাসিল রক্ষ—"কোথা হতে বাপু তুমি,
আসিযাছ হেথা?" "এসেছিল ভাই মোর
আগ্নির উদ্দেশে হেথা, গ্রাসিতে তাহাবে
তুমি করেছিলে তাড়া, যদ্যপি গ্রাসিতে,
কোথা পাইতাম তাবে এজনমে পুনঃ?"
উত্তরিল খুড়া, "হয়ে গেছে যা হবাব,
করেছিনু ভুল, আছে কন্যা সাত মোর,
লয়ে যাও তাহাদিগে দিনু অনুমতি।"
সম্ভাষি রিকন্দে লিঙ্গো হইযা বিদায়,
চলিল যথায ছিল কন্যা সাত তার।
বাহিরিয়া গৃহ হতে আসি লিঙ্গো- পাশে
প্রশ্নিল সকলে তারে, "কে তুমি যুবক?
আসিয়াছ কোথা হতে, বল তা মোদিগে।"
"পিতা তোমাদের, খুড়া সম্বন্ধে আমার,
নাম মোর লিঙ্গো, ভৃত্য ঈশ্বরের আমি।
অগ্নির উদ্দেশে আমি এসেছিনু হেথা;
ক্ষুধায় পীড়িত ভাই চারিজন মোর,
রহিয়াছে বসি দূরে মোর প্রত্যাশায়।"
"ভাই তুমি আমাদের? উত্তম সম্বন্ধ!
কেমনে ছাড়িয়া চলি যাবে ভগ্নীদিগে?
লবে না মোদিগে সঙ্গে? মোরাও যাইব।"
"আসিবে যদ্যপি তবে এস শীঘ্র করে।"
চলিল ভগিনী সাত লিঙ্গোর পশ্চাৎ।
লিঙ্গোব প্রতীক্ষা করি গোঁড় চারি ভাই
আছিল বসিযা পথ নিরীক্ষণ কবি;
দেখি দূর হতে তাকে, বলিল সানন্দে,
"ভাই লিঙ্গো আসিতেছে," উঠিল সকলে,
চাহিল লিঙ্গোর দিকে, চমকি উঠিল;
"কে ওরা লিঙ্গোর সাথে? সুন্দর উহারা!
কার কন্যাগণ সনে আসিতেছে লিঙ্গো?
দেয যদি উহাদিগে, করিব বিবাহ।"
সম্বোধি সকলে লিঙ্গো বলিলেন তবে,
"তনয়া ইহাবা শুন খুড়ার আমার;
রাঁধিযা যতনে সেবা কর ইহাদেব।"
জ্বালাইযা অগ্নি তবে গোঁড় চারি ভাই,
করি মাংস পাক, সুখে খাইল সকলে।
ভোজনান্তে বলিলেক লিঙ্গো ভগ্নীগণে,
"এবে ফিরি নিজ গৃহে যাও ত্বরা করি।"
উত্তরিল ভগ্নী সাত, "যাইবে যথায,
যাইব তথায় মোরা, না ফিরিব ঘরে।"
এত শুনি বলিলেক গোঁড় চারি ভাই,
"ভালত বলিছে এবা, স্বীকারিলে তুমি,
ভাই লিঙ্গো, মোরা সবে বিবাহ করিব।
লও বাছি সকলেব সুন্দরী যে হয়,
রবে বাকি যারা, মোরা করিব বিবাহ
তাহাদিগে।" বলিলেন লিঙ্গো—"শুন ভাই
নাহিক বাসনা মোর বিবাহ করিতে;
ভ্রাতা মোর তোমা সবে, ভগিনী উহারা,
দেখিব মাতার ন্যায় আমি উহাদিগে!
বয়সে তোমরা বড়, সর্ব্বছোট আমি;
যতন আমারে ওরা করিবে নিশ্চয়;
আনি দিবে জল খাদ্য, করিবে প্রস্তুত
শয্যা, করাইবে স্নান, বস্ত্রাদি ধুইবে।"

* অসভ্যের উপরেও সঙ্গীতের ক্ষমতা এখানে উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গোঁড় কবির এখানে বাস্তবিক কবিত্ব দেখা যায়।

"কেমনে বিবাহ লিঙ্গো কবিব আমবা?
ভাই মোবা চাব, কিন্তু ভগ্নী সাত জন।"
"জ্যেষ্ঠ তিন কব বিয়ে প্রত্যেক দুজনে,
কবিবে কণিষ্ঠ এক কন্যাকে বিবাহ।"
চলিল সকলে তবে কাচিকোপা গ্রামে,
না ছিল পুরুষ তথা, না ছিল বমণী।
হবিদ্রাদি বাটি লিঙ্গো মাখাল সকলে,
নির্ম্মিল মণ্ডপ এক, সাজাইল তায়
গাঁথি বহু পর্ণ মালা। একাপে সমাপ্ত
তবে হইলে বিবাহ, বলে জ্যেষ্ঠ ভাই,—
"কত উপকাব লিঙ্গো কবেছে মোদেব,
বিবাহেব তবে আনি দিযাছে তনযা,
পিতৃবৎ সম্মানিব তাহাকে আমবা,
আহবিযা ফলফুল আনি দিব তাবে,
শীকাব আনিব ঘোব অবণ্য হইতে,
দোলনায শুযে সুখে থাক্ লিঙ্গো ঘবে।'
বাহিবিল চাবিভাই তীবধন হাতে,
শীকাব উদ্দেশে, ঘন আঁধাব জঙ্গলে,
দোলনায শুযে লিঙ্গো সুখে নিদ্রা যায,
গোঁড পত্নী সাত জন দোলায তাহাবে।
এইরূপে কযদিন হইল অতীত।
একদা গিযাছে বনে গোঁড চাবিজন,
নিদ্রা যায দোলনায, লিঙ্গো গুরুতব,
ভাবিল ভগিনী সাত - নাহি হাসে লিঙ্গো।
নাহি কভু কহে কথা আমাদেব সনে।
না চায মোদেব পানে। কহাইব কথা
তাকে আমাদেব সনে, হাসাইব তাকে,
আমোদ প্রমোদ মিলি কবিব সকলে।
কেহ হস্ত কেহ পদ ধবিল লিঙ্গোব,
কেহবা দিইল টান ধবি তাব গাত্র।
তথাপি না দেখে লিঙ্গো মেলিযা নযন।
অবশেষে বলে লিঙ্গো ভগ্নী সাত জনে,
"হেন ব্যবহাব কেন কব মোব সনে?
ভগিনী তোমবা মোব নাহি কি স্মবণ?
দাস আমি ঈশ্ববেব, - যায যাক্ প্রাণ,
হাসিব না তবু আমি তোমাদেব সনে,
চাহিব না তবু আমি তোমাদেব পানে।"
এত শুনি জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বলিল সকলে,
"চাহিবে না লিঙ্গো তবে আমাদেব পানে?"
এত বলি আক্রমিতে অগ্রসব তাবা।
কুপিত হইল লিঙ্গো, আপাদ মস্তক
ক্রোধে হইল পূবিত, উতবিল লিঙ্গো
দ্রুত দোলনা হইতে। সম্মুখে মুদগব
ছিল পডি, লযে তাহা পহাবিল সবে।
প্রহাবিত ভগ্নী সাত যায পলাইযা।
দোলনায ফিবি লিঙ্গো পুনঃ নিদ্রা যায,
নিজ নিজ গৃহে ফিবি গেল ভগ্নী সাত।
মধ্যাহ্ন সময়ে আসে গোঁড চাবি ভাই,
মেবেছে হবিণ কেহ, কেহ খবগোস,
ময়ূব কেহ বা, ফল অনিযাছে কেহ,
আপন আপন বোঝা তাবা নামাইযা,
বলিল সকলে "চল, লিঙ্গোকে এখন ভেটিব
আমবা, দিব উপহাব ফুল।"
দোলনায নিদ্রা যায দেখিযা লিঙ্গোকে,
আপন আপন ঘবে ফিবিল সকলে।
কবিযা নিদ্রাব ভান আছিল শুইযা
ভগ্নী সাতজন, যেন জডসড ভযে।
জিজ্ঞাসিল সবে "কেন নিদ্রিত তোমবা?
কেননা দোলাও সবে লিঙ্গোব দোলনা?"
উত্তবিল তাবা-"শুন, বলি তবে শুন,
সে পোডা লজ্জাব কথা লিঙ্গোব আচাব,
হায কি লজ্জাব কথা। কতদিন আব
লুকাযে বাখিব মোবা? ছিনু এত দিন
চুপ কবি-কত দিন স'ব অপমান?
এক স্ত্রীব দুই স্বামী সম্ভবে কি কভু?
এই দণ্ডে পিতৃগৃহে "ফিবি যাব মোবা।"
এত শুনি জ্বলি ক্রোধে বলে যত গোঁড,
"বলেছিনু মোবা লিঙ্গো কবহ বিবাহ
সপ্ত ভগিনীব মধ্যে যাবে সাধ যায,
বলিল তখন ভণ্ড, পাষণ্ড, পামব,
'দেখিব ওদিকে আমি মাতাব সমান,'
শঠ লিঙ্গো প্রতাবিত কবেছে মোদিগে।
বনমধ্যে ছলে ধূর্ত্তে যাইব লইযা,
নাশি তথা তাকে, চক্ষু লইব কাটিযা,

মাবিযাছি এত দিন হরিণ খরগোস;
নূতন শীকার মোরা করিব আজিকে।
মারিয়া তাহারে, ছিঁড়ি নিব চক্ষু দুটী;
খেলিব সে চক্ষু লয়ে আমোদে আমরা।
এ প্রতিজ্ঞা যতক্ষণ নাহিক পূরিবে,
জল স্পর্শ ততক্ষণ কেহ না করিবে।"
চলিল সকলে তবে লিঙ্গোর সদন;
"উঠ লিঙ্গো উঠ ভাই" বলিল সকলে।
উত্তরিল লিঙ্গো তবে, "কি হয়েছে ভাই?
কোথা ফুল? কোথা জন্তু? খালি হাতে কেন?'
বলিল তাহারা, "এক দেখিয়াছি জন্তু
প্রকাণ্ড শরীব, বহু মারিলাম তারে,
পড়িল না তবু, কিন্তু না যায় পলায়ে
ক্লান্ত হয়ে শেষে মোবা এলাম চলিয়ে।"
উঠিয়া বসিল লিঙ্গো, ভাইদের পানে
বলিল চাহিয়া—'আমি মারিব সে জন্তু।"
লিঙ্গো সনে চাবি গোঁড় অবণ্যে চলিল;
অন্বেষিল চারিদিকে, মিলিল না জন্তু;
সম্বোধি তাদিগে তবে বলিলেন লিঙ্গো,
"গিযাছে চলিয়া যদি, ক্ষতি নাহি তায়।"
বৃক্ষমূলে বসে লিঙ্গো বিশ্রাম আশয়ে।
বলিল তাহারা, "বস, ভাই, হেথা;
আনি দিব জল তোমা", চলি কিছু দূর,
ছুড়িল চারিটী তীর আড়াল হইতে
গোঁড় চারি জন তবে লিঙ্গো লক্ষ্য করি।
সে আঘাতে বাহিরিল লিঙ্গোর পরাণ।
ছিঁড়ি লয়ে চক্ষু-দ্বয় শবদেহ হতে,
সন্ধ্যাকালে গোঁড় চারি ফিরিল আবাসে।
বলিল সম্বোধি পত্নী তবে এক জন,
"জ্বাল অগ্নি শীঘ্র করে, জ্বালহ প্রদীপ;
খেলিব আমরা সবে মিলি কুতূহলে।"
হরিযে সকলে তবে হাঁটু গাড়ি বসি,
আরম্ভিল খেলিবারে চক্ষু দুটী লয়ে।

তৃতীয় ভাগ

লিঙ্গোর পুনর্জীবন এবং গোঁড়দিগের উদ্ধার

লিঙ্গোর শুনিয়া মৃত্যু দেব ভগবান,
দূতহাতে প্রেরিলেন অমৃত ত্বরিতে।
অমৃত সিঞ্চনে লিঙ্গো পাইয়া জীবন,
জিজ্ঞাসিল দূতে, "কোথা ভাই সব মোর?"
"সে শঠ ভ্রাতার কথা করোনা জিজ্ঞাসা:
সাধিয়াছে নিদারুণ শত্রুতা তাহারা;
জীবন হরিয়াছিল তাহারা তোমার;
অমৃতের বলে প্রাণ পেয়েছ আবার।
কোথায় যাইবে লিঙ্গো বল তা এখন।"
দূতের শুনিয়া কথা বলে গুরুবর,
"যাব আমি আছে যথা বন্দী গোঁড়গণ।"*
গহন কাননে লিঙ্গো চলিতে লাগিল,
উদ্ধারিতে গোঁড়-কুল সঙ্কল্প তাহার।
আসিল রজনী ঘোর-তিমির-বসনা;
বিচরে উল্লাসে ব্যাঘ্র খাদ্যের উদ্দেশে;
কুক্কুট ছাড়িল ডাক, ডাকিল ময়র,
শৃগালের রবে বন হইল পূরিত;
ব্যাঘ্র-ভয়ে বৃক্ষোপরে লিঙ্গোর বিশ্রাম।

* পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহাদেবের আজ্ঞায় সমুদয় গোঁড় (চারিজন ব্যতীত) ধবলগিরিতে কারাবদ্ধ।

নিশা অবসানে পুনঃ ডাকিল কুক্কুট,
বক্তিমে রঞ্জিত পূর্ব্বে শোভিল অম্বর,
বৃক্ষ হতে নামি তবে লিঙ্গো নরবব,
কবপুটে প্রণমিয়া জিজ্ঞাসে সূরযে,
"কারারুদ্ধ কোথা, দেব, জান গোঁড়গণ?"
লিঙ্গোর শুনিয়া প্রশ্ন উত্তরে তপন,
"ব্যস্ত থাকি সারাদিন ঈশ্বরের কাযে,
নাহি জানি, লিঙ্গো, তব গোঁড়ের বারতা।"
চলিতে চলিতে লিঙ্গো ভেটিলেক ঋষি,
নাম কুমায়ত তার, জিজ্ঞাসিল তারে
লিঙ্গো গোঁড়ের বারতা। উত্তরিল ঋষি,-
"গর্দ্দভ সমান গোঁড় অত্যন্ত নির্ব্বোধ,
অতি হেয়, খাদ্য যার বিড়াল মূষিক,
শূকর, মহিষ আরো নাম লব কত,
ধবলাগিরির এক গুহার ভিতর,
বন্দী এবে তারা সবে; দৈত্য ভস্মাসুর
প্রহরী তথায় মহাদেবের আদেশে।"
গোঁড়ের উদ্ধার শুনি মহাদেব হাতে,
তুষিতে শিবেরে লিঙ্গো আরম্ভিল তপ।
সাধিল দ্বাদশমাস সে তপ কঠোর;
নড়িল ধবলাগিরি তাহার প্রভাবে,
নড়িল কনকাসন পিনাক-পাণির।
কোন্ সাধু রত হেন সুকঠোর তপে?
চিন্তিল ধূর্জ্জটি হেন; হইল বিস্মিত;
নিষ্ক্রমিল সেইক্ষণে সাধু অন্বেষণে।
আসিয়া লিঙ্গোর কাছে, দেখিল তাহার
অস্থি-চর্ম্ম-সার, দেহে নাহি মাংসলেশ।
জিজ্ঞাসিল তারে দেব, "কি তব কামনা?"
উত্তরিল সবিনয়ে তবে গুরুবর—
"ছাড়ি দেও গোঁড়গণে, এই ভিক্ষা মোর।"
শুনিয়া গোঁড়ের কথা বলে মহাদেব,
"গোঁড় ছাড়া আর কিছু চাই-সাধুবর,
রাজত্ব, বিপুল ধন, যাহা ইচ্ছা যায়।"
লিঙ্গোর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রহিল অটল;
"না চাহি কিছুই আব, চাহিমাত্র গোঁড়।"
এত শুনি মহাদেব ভকতবৎসল,
গোঁড়কে করিতে মুক্ত দেন অনুমতি।
পিনাকপাণির আজ্ঞা শুনি নাবাযণ,*
বিষণ্ন বদনে বলে সম্ভাষি শিবেরে;
"ভাল ছিল, বন্দী গোঁড় মরিত যদ্যপি,
হইতাম সুখী বড় আমরা সকলে।
বাহির হইলে গোঁড়, আচরিবে পুনঃ,
পূর্ব্বের মতন; কাক, শকুনী, গৃধিনী,
খাইবে অখাদ্য কত; আবার দুর্গন্ধে
পূরিবে ধবলাগিরি।" উত্তরিল শিব,
"প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা, না হয় অন্যথা,"
এত শুনি নারায়ণ চিন্তিল উপায়,—
"বিন্দো নামে আছে পক্ষী সমুদ্রেব তীরে,
আনিতে যদ্যপি পার শাবক তাহার,
পাইবেক মুক্তি লিঙ্গো, তবে গোঁড়গণ।"
"তথাস্তু" চলিল লিঙ্গো সাগর সন্নিধে;
হেরিল তথায় পক্ষীশাবক দুইটী।
বড় ভয়ঙ্কর সেই বিন্দো বিহঙ্গম;
বিনাশি গজেন্দ্র চক্ষু খাইত তাহার,
মাথার মগজ আনি দিইত শাবকে।
বিহঙ্গ বিহঙ্গী গেছে খাদ্য অন্বেষণে,
কুলায় শাবকে লিঙ্গো পাইল দেখিতে,
মনে মনে বিবেচিল ধার্ম্মিক প্রবর,—
লয়ে যাই যদি এবে বিন্দোর শাবক,
তস্করের পাপে আমি হব কলুষিত;
অতএব যতক্ষণ বিহঙ্গ বিহঙ্গী
নাহিক আইসে ফিরি, রহিব হেথায়।
হেন কালে নাগ এক ভীষণ মূরতি,
স্থূল যেন বৃক্ষগুঁড়ী, বিস্তারিয়া ফণা,

* এই "নারায়ণ" বিষ্ণু নহেন। গোঁড় কবি প্রসিদ্ধ হিন্দুদেবের নামে মহাদেবের কোন সঙ্গ ।কে নির্দেশ করিয়াছেন।

সমুদ্র হইতে আসি হেলিয়া দুলিয়া,
ভক্ষিতে শাবকদ্বয়ে হয় অগ্রসর।
ত্রাসিত তাহারা উচ্চে করিল ক্রন্দন,
যোজিয়া ধনুকে লিঙ্গো তীক্ষ্ণ শর তবে,
নাশি নাগে সপ্তখণ্ড করিল তাহায়।
বিহঙ্গম বিহঙ্গমী এমন সময়ে,
প্রত্যাগত বন হতে খাদ্য নানা লয়ে।
জননী হস্তীর ওষ্ঠ আর চক্ষুদ্বয়
সযত্নে সন্তানে দেয় ভক্ষণের তরে।
নাহি খায় বাছা কিন্তু কিছুই তাহার,
তাহা দেখি জননীর উপজিল দুঃখ,
সম্ভাষি স্বামীকে তবে বলিতে লাগিল,—
"না জানি খায় না বাছা কিসের লাগিয়া;
বুঝিবা দিয়াছে দৃষ্টি কোন দুষ্ট জন।"
প্রিয়ার বচন শুনি বলে বিন্দো পক্ষী,
"দেখহ মনুষ্য এক বসি বৃক্ষতলে,
মারিলে মধুর খাদ্য হবে বাছাদের।"
শুনিয়া পিতার কথা বলিছে শাবক,—
"একাকী মোদিগে হেথা রাখিয়া তোমরা,
অরণ্যে চলিয়া যাও খাদ্য অন্বেষণে;
কে করিবে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ?
সমুদ্র হইতে নাগ এসেছিল এক;
যদি না থাকিত অই মনুষ্য হেথায়,
যাইত নাগের হাতে জীবন নিশ্চয়;
ভোজন করাও অগ্রে জীবনরক্ষকে;
তারপর খাদ্য মোরা খাইবো হরিষে।"
বিহঙ্গিণী শুনি তবে শাবক বচন,
উতরিয়া দ্রুতগতি লিঙ্গোর সদন,
হেরিল সপত খণ্ডে নাশিত ভুজঙ্গ।
সকৃতজ্ঞে বলে তবে লিঙ্গো সাধুবরে;—
"সাতবার করিয়াছি সন্তান প্রসব,
সাতবার নিঃসন্তান করিয়াছে নাগ;
যদি না থাকিত আজ, নরশ্রেষ্ঠ, হেথা,
হারাইত অভাগিনী আজিকে শাবক।
উঠ ভাই, উঠ পিতা, বল কোথা হতে
আসিয়াছ তুমি, কিবা বাসনা তোমার"
উত্তরিল লিঙ্গো,"যোগি আমি শুন, বিন্দো,
শাবক লইতে তব এসেছিনু হেথা।"
লিঙ্গোর বাসনা শুনি কাঁদয়ে বিহঙ্গী—
"যাহা চাও তাহা দিব কিন্তু এ মিনতি,
চাহিও না বাছাদিগে লয়ে যেতে সাধু।"
বিহঙ্গীর কান্না দেখি আশ্বাসিল লিঙ্গো,
"দেখাইতে মাত্র শিবে লইব শাবক।"
লিঙ্গোর বচন শুনি আনন্দিত বিন্দো;
"দেখাইতে মহাদেবে শাবক আমার,
সানন্দে তোমার সঙ্গে যাব সাধুবর।
এত বলি বিহঙ্গমী পক্ষের উপর,
লইল লিঙ্গোকে আর শাবক তাহার।
তাহা দেখি বিবেচিল বিন্দো বিহঙ্গম,—
একাকী এ শূন্য গৃহে কি ফল থাকিয়া,
সম্বোধি লিঙ্গোকে তবে বলিল বিহঙ্গ—
"সূর্য্যের উত্তাপে কষ্ট পাবে সাধুবর,
অতএব যাব আমি আবরি তোমায়।"
বিন্দো সঙ্গে দেখি লিঙ্গো মহাদেব বলে,
"লিঙ্গোর অসাধ্য ক্রিয়া নাহিক জগতে,
জানিতাম লিঙ্গো লয়ে আসিবে শাবক।
লয়ে যাও গোঁড় তব দিনু অনুমতি।"
কারামুক্ত গোঁড় তবে লইয়া বাহির,
প্রণমিয়া বলে "লিঙ্গো, গোঁড়ের রক্ষক,
তোমা বিনা আমাদের কেহ নাহি আর।"

চতুর্থ ভাগ
গোঁড়দিগের গোত্র বিভাগ ও দেবতা পূজা

কাটিয়া জঙ্গল গোঁড় নিরমিল গৃহ,
ক্রমশ হইল গ্রাম "নরভূমি" নাম।
ক্রমশ তথায় হাট বসিতে লাগিল;
ক্রমশ কৃষক পায় বলদ, শকট।*
একদা লিঙ্গোকে বেষ্টি বসিয়াছে সবে,
সম্বোধি তাদিগে গুরু বলিতে লাগিল,
"না বুঝ কিছুই শুন, হে গোঁড়, তোমরা;
না জান কে ভাই, নাহি জান পিতা কেবা;
নাহি জান কার সনে বিবাহ বিধেয়।"
উত্তরিল নম্রভাবে সভাস্থ সকলে,
"সত্য কথা বলিয়াছ, গুণের সাগর।
তোমার মতন জ্ঞান আছে বল কার?
জাতিতে বিভাগ লিঙ্গো কর আমাদিগে।"
লিঙ্গোব আদেশে গোঁড় হয অষ্ট গোত্র।
অতঃপব বলে লিঙ্গো শুন ভাইগণ।
"ঈশ্বরের কভু মোরা, না পাই দর্শন;
অতএব এস মোবা নির্ম্মিব দেবতা,
সকলে মিলিযা পূজা করিব তাহার
এক স্বরে গোঁড় সবে দিইলে সম্মতি,
লিঙ্গো বলে, "আন হেথা ছাগের শাবক,
আনহ মোরগ এক, গাভি বৎস আর।
ফর্শাপেন নাম সেই পাইবে দেবতা;
আহরি অরণ্য হতে আন কাষ্ঠখণ্ড;
কাষ্ঠদেব বলি তারে পূজিবে সকলে;
দেবতা আরেক শুন ঘণ্টার শৃঙ্খল,
চামর হইবে শুন দেবতা চতুর্থ।"**

ইহার পর দেবতাদিগের পূজা বর্ণিত হইয়াছে; তাহার প্রধান অঙ্গ মদ্য পান, আমোদ প্রমোদ ও বলিদান। পঞ্চম খণ্ডে গোঁড়কবি বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন। এ সকল বিষয় পাঠকের নিকট সম্ভবত নীরস বোধ হইবে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

(ভারতী ৮ম বর্ষ মাঘ পৃ ৪৩৩-৪৩৬, ফাল্গুন পৃ ৪৭৩-৪৭৫, ১২৯১;
৯ম বর্ষ জৈষ্ঠ, পৃ ৬৭-৭০, ১২৯২)

---

* অর্দ্ধসভ্য প্রদেশে রীতিমত বাজার থাকে না, কোন বড়গোছের গ্রামে নির্দিষ্ট দিনে হাট হয়। সেই হাটে নিকটস্থ পল্লী সমূহের স্ত্রী পুরুষেরা ক্রয় বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের প্রথমাবস্থায় বলদের প্রয়োজন করে না। (গত মাঘ মাসের 'ভারতী' দেখ)। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল ও বলদ ব্যবহৃত হয়।

** গোঁড়ের ন্যায় অসভ্য জাতির দেবতা সমূহের এরূপ উৎপত্তি কতকটা হাস্যজনক হইলেও শিক্ষাদায়ক।

চতুর্থ অধ্যায়

ময়ূরভঞ্জের খনিজ ধন

(ইংরাজী প্রবন্ধ - Notes on the Geology and Mineral Resources of Mayurbhanj – By P.N. Bose, B.Sc., F. G. S , *Late Deputy Suptdt, Geological Survey of India* হইতে সংকলিত)

উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক অবস্থা এতাবৎ ভূতত্ত্ববিদগণের সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। অদ্যাবধি কোন ভূতত্ত্ববিদই তথাকার কোন তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। গত ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৪ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমি তথাকার কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করি। এই পরিদর্শনের ফল নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

ময়ূরভঞ্জের কতক অংশ শৈলময় ও কতক সমতল ভূমি; আমি প্রধানতঃ প্রথমোক্তরূপ স্থান সকলই পরিদর্শন করিয়াছি। এই স্থানের পরিমাণ প্রায় ২৪০০ বর্গমাইল। ইহার কতক অংশ খাস ময়ূরভঞ্জের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে এবং কতক অংশ বামনঘাটী ও পাঁচপীর মহকুমায় অবস্থিত।

সমতল প্রদেশের অতি অল্প স্থানই আমি পরিদর্শন করিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করিবার নাই; তবে এস্থলে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদনগরের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে মোলিয়া নামক স্থানে বড়বালাং নদীগর্ভে এক প্রকার চুণাপাথর দেখা গেল, তাহার রং কতক হরিদ্রাবর্ণ ও কতক হরিদ্রার আভাযুক্ত কপিশ। এই পাথরে অষ্ট্রিয়া (Ostrea) জাতীয় প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (Fossils) অনেক পরিলক্ষিত হইল। আমি উহা ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী পিলগ্রিম সাহেবের পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কোন পরিচিত অষ্ট্রিয়া (Ostraea) জাতীয় কঙ্কালের সহিত উহার সৌসাদৃশ্য দেখেন নাই। তাঁহার মতে উহার কতকটা Ostraea multicostata জাতীয় কঙ্কালের সহিত সাদৃশ্য আছে। বেলুচিস্থানের নারীনদীর গর্ভে যে এক প্রকার এই জাতীয় কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল ইহা অনেকটা তাহারই মত। পণ্ডিচারী হইতে খাসিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মধ্যে পূর্ব্বভারতের

কোন স্থানেই গণ্ডোয়ানার পরবর্ত্তী কঙ্কাল সংযুক্ত পাহাড় অদ্যাবধি দেখা যায় নাই, সুতরাং ময়ূরভঞ্জের বড়বালাং নদীগর্ভস্থ এই নবাবিষ্কৃত প্রস্তর ভারতের ভূতত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই রাজ্যের সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আমার অনুমান হয় যে মোলিয়ার ন্যায় সেখানেও এইরূপ কঙ্কালময় স্তর দেখা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে এখানকার ভূগর্ভে যে সকল ধাতু দেখিলাম তাহার বিষয় বলিতেছি।

ঃ লৌহ ঃ

লৌহের আকরই ময়ূরভঞ্জের প্রধান খনিজ ধন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ বিস্তীর্ণ ও ধাতুপূর্ণ লৌহ খনি অল্পই আছে। বামনঘাট বিভাগের নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় ঃ—

১) গুরুমৈশানী পাহাড়ের পাদদেশে ও সানুদেশে প্রায় ৮ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে পূর্ব্বাংশ ব্যতীত উহা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইল।

২) সারন্দাপীর নামক স্থানের বাঁধগাঁয়ের নিকটে।

৩) সুলাইপত-বাদামপাহাড় শ্রেণীর পাদদেশে ও পার্শ্বে। এই স্থানটী বামনঘাটী বিভাগের দক্ষিণ প্রান্তে কণ্ডাডিরা হইতে যৈধানপোশী পর্য্যন্ত প্রায় ছয় ক্রোশ ব্যাপী।

পাঁচপীর বিভাগের সিমলী পাহাড়ের প্রান্ত দিয়া যে শৈল শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পাদদেশে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের অনেক স্থানেই লৌহের আকর পরিদৃষ্ট হইল। কামদাবেদী ও কনতিকনা হইতে ঠাকুর মুণ্ডা পর্য্যন্ত এই স্থানটী প্রায় ২৫ মাইল।

খাস ময়ূরভঞ্জে গুড়গুড়িয়ার নিকট সীমলি পাহাড়ের কতকগুলি স্থানেও লোহার খনি দেখা গেল। এই সকল লোহা মৃত্তিকা ও প্রস্তরের সহিত চাপ বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোহার চাঁই বা চাপ কতক লাল বর্ণের Haematite এবং কতক গাঢ় ধুসর বর্ণের Magnetite. এই শেষোক্ত প্রকারের লৌহ গুরুমৈশানি পাহাড়ের পাদদেশে ও পার্শ্বদেশে, যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোলাইশিলার দক্ষিণ পূর্ব্বে, সুন্দলের পূর্ব্ব দিকে এবং কোটাপিঠির নিকটেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বামনঘাটী ও পাঁচপীর বিভাগের আকরের লৌহ হইতে শতকরা ৬০/৬৫ ভাগ পরিষ্কৃত লৌহ বাহির হইতে পারে।

এই সমস্ত আকর হইতে কি পরিমাণ লৌহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। কিন্তু বোধ হয় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এখানে যদি হালি গালাই করিবার হাপর কয়েকটী স্থাপন করা যায় তাহা হইলে উহা চিরদিনই সমান চলিতে পারে, কোন দিন মালাভাব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সিনী-ঘাটশিলা ষ্টেশন হইতে এই সকল খনিতে সহজে যাওয়া

যায়। আব যদি ২৫/৩০ মাইল রেলপথ লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে গুরুমৈশানীর আকরেব নিকট পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

এই সকল আকরের সন্নিকটে অনেকগুলি গালাইকব বাস করে। তাহারা যে লৌহ প্রস্তুত করে, লোকে তাহার যথেষ্ট আদর করে। কিন্তু তাহাদিগের হাপর বড়ই ছোট এবং তাহারা যে জাঁতা ব্যবহার কবে তাহা কোন কাজেরই নহে। ভারতের আর কোথাও আমি এরূপ কমজোব জাঁতা ব্যবহাব করিতে দেখি নাই। এই কারণে গালাইকরেরা যাহা সহজে গলে এরূপ আকরের লৌহই গালাই করে। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হওযা সম্ভব নহে। এই সকল গালাইকরকে আমি কয়েক খণ্ড ধূসর বর্ণের চৌম্বক লৌহ (Magnetite) দেখাইয়া ছিলাম। তাহারা বলিল উহা পাথরমাত্র এবং ধাতুর হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য!! এখানকার অনেক স্থানে লাল ও হরিদ্রা বর্ণের মাটী (Red and yellow ochre) দেখিলাম। এই সকল মাটিতে স্থানীয় সাঁওতালেরা তাহাদিগের গৃহাদি রঞ্জিত করিয়া থাকে। কলিকাতায় এ মাটী চালান দিতে পারিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা।

ধালভূমের প্রান্তে মৈলাম ঘাটী নামক স্থানে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত গন্ধক (Iron pyrites) দেখা গেল।

ঃ ম্যাঙ্গানীজ ঃ

খাস ময়ূরভঞ্জে কুলিয়ানার নিকটে লেটারাইট প্রস্তরে (Laterite) ম্যাঙ্গানীজের চিহ্ন দেখিলাম তবে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না।

ঃ সুবর্ণ ঃ

সুবর্ণরেখা নদী ময়ূরভঞ্জের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত, তদ্ব্যতীত বামনঘাটীতে কদকৈ ও বোড়াই নামে দুইটী নদী আছে। এই কয়টী নদীতেই মাটী ধুইয়া সোণা বাহির করা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রণালীতে সোনা বাহির করা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। তবে সপগোরা ও কুদেরসাইয়ের নিকটে বোড়াই নদীতে যাহা দেখিয়াছি এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। এখানকার প্রায় দুইবর্গ মাইল পরিমাণ চর ভূমি অল্পাধিক পরিমাণে সুবর্ণপ্রসূ। এই স্থানের প্রায় পঞ্চাশ ঘর লোক এই মাটী ধুইয়া সোণা বাহির করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই মৃত্তিকার উপরিভাগে যথেষ্ট সোণা আছে। বৎসর বৎসর বর্ষাকালে যে ধোয়াট আসে তাহাতেই বোধ হয় উপরিভাগে অধিক পরিমাণে সোণা পড়িয়া থাকে। উহারা উপরিভাগের মাটীমাত্র চাঁচিয়া নদীর জলে তাহা ধুইতে থাকে এবং তাহা হইতে সোণা বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। স্থানে স্থানে টুকরা টুকরা স্বর্ণ সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ডও দেখা গেল, কিন্তু এরূপ টুকরা আধ তোলার বেশী ওজনের কোথাও দেখিতে পাই নাই।

যে চর ভূমিতে সোণা থাকে তাহা দেখিতে ঈষৎ কটা বর্ণের এবং উপরিকার স্তর খুব পাতলা রূপে বিস্তৃত। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এই স্তরের দুই ফিট নীচে পর্য্যন্ত সোণা আছে।

গোদিয়া নদী ও তাহার শাখার নিকটবর্ত্তী রুয়াসী ও গোহাদনগিরির পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে একটী স্থান আছে সেখানেও সোণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটি কুদারসই - সাপগোরার নিকট, কেবলমাত্র মধ্যে একটি পাহাড়ের ব্যবধান। এখানে প্রায় ১২ ফিট হইতে ১৫ ফিট পর্য্যন্ত মাটির নীচে সোণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সোণা প্রস্তর ও বালুকাময় কর্দ্দমে মিশ্রিত। গোদিয়া নদীর একটি শাখা আছে তাহার নাম বণিজ বরণ। এই নদীতীরস্থ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া দেখিলাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ সুবর্ণ সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ড এখানে দুই তিন তোলা ওজন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় বিশ ঘর লোক এইরূপে সোণা বাহির করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কখন কখন ধালভূম হইতেও এখানে এই সোণা বাহির করিবার জন্য লোক আসিয়া থাকে। এই ব্যবসা যে বেশ লাভজনক ও অল্পায়াসসাধ্য তাহা যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। ইহারা অতি সামান্য রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া থাকে। যদিও উল্লিখিত চরভূমির অনেক নীচে পর্য্যন্ত সোণা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার লোক কেবলমাত্র উপরিভাগের স্তর ধুইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। আমি এক স্থানে দেখিয়াছি যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচের স্তরেই উৎকৃষ্ট স্বর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু তাহারা সে কথা জানে না এবং জানিলেও সে জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত নহে। যখন উপরকার মাটি চাঁচিয়া যাহা বাহির হয় তাহাতেই সংসার চলে, তখন আর অধিক পরিশ্রম করা তাহারা আবশ্যক মনে করে না।

উন্নত প্রণালীতে এই সোণা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা লাভজনক হইবে কি না তাহা বিস্তৃতরূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বলা যায় না। আমি সেরূপ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই। বর্ষাকালই এইরূপ পরীক্ষা করিবার প্রশস্ত সময়। সে সময় নদী সকল জলপূর্ণ থাকাতে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

ঃ অভ্র ঃ

বামনঘাটী বিভাগে রাইবেদী ও তিরিং নামক স্থানে অভ্র আছে। কিন্তু যেখানে যেখানে খনন করিয়া দেখিয়াছি কোথাও বড় আকারের অভ্র দেখিলাম না। কোথাও দুই-তিন ইঞ্চি অপেক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া গেল না। এজন্য আমার মনে হয় তথায় বৃহদায়তন অভ্র আদৌ নাই।

খাস ময়ুরভঞ্জের নিকট শিরসা, বনগারপসী ও জামগড়িয়াতে অভ্র আছে। শেষোক্ত স্থানটি আশাজনক বলিয়া মনে হইল। শঙ্করাই নদীর তীরে অনেক দূর

পর্যন্ত অভ্রের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। উপরিভাগ খনন করিয়া আট ইঞ্চি ও তদূর্দ্ধ মাপের পর্য্যন্ত অভ্র পাইয়াছি। বিশেষ পরীক্ষার জন্য এখানে খনন কার্য্য চলিতেছে।

ঃ চূণাপাথর ঃ

বামনঘাটী বিভাগের রণগম, অসুরঘাটী, গুরুমৈশানী পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে, গুড়গুড়িয়ার পশ্চিমস্থ সীমলী পাহাড়ে এবং পাঁচপীর বিভাগের অলকাদের নামক স্থানে চূণা পাথর আছে।

ঃ বিবিধ ঃ

বারিপদের নিকট লেটারাইট (Laterite) পাথরের নীচে এক প্রকার মাটি আছে তাহা চীনা বাসন করিবার বেশ উপযোগী। এতদ্ব্যতীত আসবেষ্টস্ (Asbestos), ওপাল (Opal) প্রভৃতি অনেক খনিজ পদার্থও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম। বাসনের উপযোগী পাথরও অনেক স্থানে আছে। খাস ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কুলিয়ানাতে ছুরি কাঁচি শানাইবার পাথর ও জাঁতা তৈয়ার হইয়া থাকে। বামনঘাটীর কোন কোন স্থানে আগেট (Agate) জ্যাস্পার (Jasper) প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরও যথেষ্ট পরিমাণ আছে।

('কমলা' পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১৩১০ - ১১, পৃষ্ঠা - ৪১২ - ৪১৪)

সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ

মুখবন্ধ

গত দেড়শত বৎসর পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিজ্ঞান চর্চ্চা এত প্রবল বেগে চলিয়াছে যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হয়। রসায়নাদি প্রাচীন বিজ্ঞান সমুদয় এত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যে তাহাদের চেনা দুষ্কর। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে — যথা ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব ইত্যাদি। প্রত্যেক বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা আবার এত পরিপুষ্ট হইয়াছে, যে ঐ সকলের কোনও একটার অনুশীলনে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিলেও উহাকে অধিকৃত কবা সুকঠিন। কিন্তু সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, অথচ সমাজতত্ত্ব সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয়। সারথীর অভাবে তেজস্বী তুরঙ্গ যেমন রথকে নক্ষত্র বেগে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শেষে বিপথে চলিয়া রথটিকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার সম্ভাবনাই অধিক, তেমনি অসংযত বৈজ্ঞানিক বলে সমাজকে দ্রুতগতিতে লইয়া গিয়া জনসাধারণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজতত্ত্বরূপ নিপুণ পরিচালকের অভাবে তাহা এমন বিপৎসঙ্কুল স্থানে নীত হইতে পারে যে সেখানে সমাজের উন্নতি হওয়া তো দূবের কথা, তাহার স্থায়িত্ব বিষয়েই সন্দিহান হইতে হয়। সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, যে ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা হইয়াছে।

ইউরোপে যে সমাজতত্ত্বের আলোচনা হয় নাই তাহা নহে। অন্যান্য বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসংখ্যার সমতুল্য না হইলেও এ বিষয়ের গ্রন্থসংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে। কম্‌টি, গিজো, হার্বার্ট স্পেনসর, বক্‌ল, মীল প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখক সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। কমটি সমাজ বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। তিনিই প্রথমে ইহার প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া সভ্যতার বিকাশের ক্রম বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেনসর কম্‌টির সমকক্ষ। তাঁহাদের মত বৈজ্ঞানিক ইউরোপে বিরল। সমাজতত্ত্ব কি, তাহার অনুশীলনের কি কি বিশেষ প্রতিবন্ধক, এবং উহার জন্য কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, তাঁহারা এবম্বিধ বহু বিষয়ের সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তাহাতে যদি তাঁহারা প্রাচ্য সভ্যতার প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্যকরূপে অবগত থাকিতেন, এবং প্রতীচ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অতিক্রম করিয়া সভ্যতার সমগ্র অনুসন্ধেয় তথ্য, অধিকতর নির্লিপ্ত ভাবে

পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সমাজ বিজ্ঞানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পরিত। কিন্তু পাশ্চাত্য মনস্বীগণ সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজকে সভ্য সমাজের অগ্রণী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মানদণ্ডে অন্যান্য সভ্যতার পরিমাণ করিয়াছেন। ইহা হওয়া স্বাভাবিক। পৃথিবীতে যত সভ্য সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, সকলেরই কাছে স্ব স্ব সমাজই আদর্শ বলিযা ও অন্যান্য সমাজ বর্ব্বর বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও এইরূপে অসমদর্শিতার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে আমার মত নগণ্য ব্যক্তি তাহাদের মত প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিকগণেব দোষ ধরিবাব, বা সমাজতত্ত্বেব মত জটিল বিষয়ের অবতাবণা করিবার অধিকার কি? তাঁহাদের মত মনস্বীগণ যদি নিরপেক্ষ ভাবে এ বিষয়ের বিচাব করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ঐ বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবাব সম্ভাবনা কি ? সে সম্ভাবনা যে থাকিতে পারে, নিম্নে তাহার কয়েকটী হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ আমবা নব্যভারতের লোক, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য সমাজকে মুখে না হৌক মনে মনে, সমাজের আদর্শ বলিয়া মানিয়া থাকি, এবং ঐ সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতিকে আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি। মেকলে বলিয়াছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসী নামে ভারতবাসী থাকিবে কার্য্যতঃ ইংরাজ হইবে; হইয়াছেও তাহাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগকে পাশ্চাত্য দৃষ্টি দিয়াছে। আমাদেব চিন্তার স্বাধীনতা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। প্রতীচ্য খণ্ডে যাহার আদর নাই আমাদের মধ্যেও তাহার আদর নাই। বিলাতী ধরনের না হইলে, বিলাতী নজির বা বিলাতী ছাপ না থাকিলে আমরা কোন দেশী বস্তুই আদর করি না। ইদানীং যে জাতীয় ভাবোদ্রেকের কথা শুনা যায় তাহাও অনেকটা পাশ্চাত্য ভাব মিশ্রিত, এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রণালীও পাশ্চাত্য ধরনের। আমিও আজীবন পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে আমার মত একজন নব্য ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে হেয় জ্ঞান করা অপেক্ষা তাহার পক্ষপাতী হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব তাহা অবিচার দোষে দুষ্ট হইবে না তাহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ নব্যভারতে প্রাচ্য সভ্যতার প্রভাব যদিও নির্ব্বাপিত প্রায়, তথাপি এখনও নিঃশেষরূপে নষ্ট হয় নাই, ভস্মাবৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছে। মধ্যে মধ্যে, ঘটনা ক্রমে, তাহার উত্তাপ এখনও অনুভূত হইতে দেখা যায়। উপস্থিত সাহিত্য সেবকমণ্ডলীর মধ্যে, অনেকের ন্যায় আমার

সম্বন্ধে এইরূপই ঘটিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনাব সমালোচনা কবা আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব, প্রতীচ্য দেশবাসীর পক্ষে ততটা নহে।

তৃতীয়তঃ ভারতে যদিও সমাজ বিজ্ঞান রূপ কোনও স্বতন্ত্র শাস্ত্র ছিল না, তথাপি বহু সহস্রবৎসরব্যাপী মানসিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের মহাপুরুষেরা ঐ বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থনীতিশাস্ত্র, পুরাণ, মহাভারতাদিতে তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা ঐ সত্যগুলির উপব বিবিধ সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থা এরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে তাঁহাদের অদ্ভুত জ্ঞানবহ্নি যেন এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। অল্পায়াসে সেই সেই জ্ঞান আমাদেব অধিকৃত হইতে পারে।

চতুর্থতঃ ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের একটী ক্ষুদ্র আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে একদিকে যেমন অভ্রভেদীতুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী, শস্যশ্যামল সুবিস্তীর্ণ সমতল, বিশাল বালুকাময় পাদপবিহীন মরুভূমি প্রভৃতি প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি অন্যদিকে অসভ্যতার নিম্নস্তর হইতে সভ্যতার উচ্চতম স্তব পর্য্যন্ত মানব জাতির বহুবিধ সামাজিক অবস্থা লক্ষিত হয়। সমাজতত্ত্বানুসন্ধানেব সুবিধা ভারতবর্ষে যেমন তেমন আর অন্য কোনও দেশে নাই, কার্য্যগতিকে আমি কতকটা সেই সুবিধার ফল সংগ্রহ করিতে পাবিয়াছি।

সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ

ক্রমবিকাশ জীবজগতের নিয়ম

"জীবোব্রহ্মৈব" — ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে সহস্র সহস্র গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্য এই দুইটি কথাতে তাহার সার প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবল অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত অগোচর ক্ষুদ্রতম জীব হইতে স্থূলকায় পশু পর্য্যন্ত সমগ্র বসুধার সহিত আমাদের কুটুম্বিতা। মানবভ্রূণের পরিণতির ক্রমের মধ্যে হীনতম হইতে শ্রেষ্ঠতম জীবদেহ পরম্পরায় মনুষ্যের ক্রমবিকাশের পুনরাবৃত্তি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পশুদিগের সহিত মনুষ্যের শারীরিক সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। উভয়ের দেহ সর্ব্বতোভাবে একই উপাদানে গঠিত। উচ্চ শ্রেণীস্থ বানরদেহে প্রত্যেক পেশী, প্রত্যেক শিরা ও প্রত্যেক অস্থি যেরূপে সন্নিবিষ্ট, মনুষ্যদেহেও ইহারা অবিকল সেইরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অস্থিসংস্থান বিদ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, নিম্নশ্রেণীস্থ বানরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অনেক নিকট। চিত্তবৃত্তির বিষয়েও কতিপয় শ্রেষ্ঠ পশুর সহিত মানবের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়। স্নেহ, হিংসা, ঈর্ষা, ভয় বা সাহস কতকগুলি পশুতেও যেমন আছে, মনুষ্য হৃদয়েও সেই রূপ বিদ্যমান।

কিন্তু দুইটি প্রধান বিষয়ে মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ লক্ষিত হয় —

প্রথম — যতদূর প্রাচীন কালের কোনও নিশ্চিতবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সেই সময় হইতেই পশুদের অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধি সাতিশয় পরিপুষ্ট।

দ্বিতীয় — ধীশক্তি সম্বন্ধে মনুষ্য ও পশুতে যে প্রভেদ, দুইটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা অধিকতর পার্থক্য দৃষ্ট হয় —

১) আধ্যাত্মিক বৃত্তি, যদ্দ্বারা মানুষ অলৌকিক জীবে ও জন্মান্তর বিশ্বাস করে, এবং (২) নৈতিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা মনুষ্য লাভের ও শারীরিক সুখ ও দুঃখের অতীত নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারে। পশুদের মধ্যে এই দুই শক্তি যদি কখন দেখা যায়, তবে তাহা এরূপ অঙ্কুর অবস্থাতে, যে তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হয় না; কিন্তু আদিম মানবের, এবং তাহার সমতুল্য আধুনিক অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও এই দুই শক্তি থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিম প্রস্তর যুগের যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তিকে তাহার অস্ত্রাদির সহিত সমাহিত করা হইত। এবং কখন কখন তাহার আত্মার ভোজনের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ খাদ্যও দেওয়া হইত। নব্যপ্রস্তরযুগের মনুষ্যগণ মৃতের সমাধির উপর প্রস্তরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিত, এবং মৃতাত্মাকে দান করিবার উদ্দেশ্যে সমাধির ভিতর অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্রাদি এবং অলঙ্কার নিক্ষেপ করিত। পৃথিবীর কোনও স্থানে এমন কোনও অসভ্য জাতি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার একেবারে কোনও ধর্ম্ম নাই। মনুষ্যতত্ত্ববেত্তারা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন যে, অসভ্য জাতিরা নৈতিক জ্ঞান বিরহিত নহে। অতি হীন অসভ্যজাতিদের ভিতরেও সম্পত্তি জ্ঞান, মনুষ্যজীবনের প্রতি সমাদর, এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে। এমন কোন অসভ্যজাতির বিষয় জানা যায় নাই যাহারা চৌর্য্য ও হত্যাকে অন্যায় ভাবে না, ও যাহাদের অল্পবিস্তর ধর্ম্মভাব নাই।

এইরূপে মনুষ্যের তিনটি অবস্থা লক্ষিত হয় -

প্রথম — পাশবিক অবস্থা, যাহাতে শরীর ও বহুতর চিত্তবৃত্তি বিষয়ে পশু হইতে মানুষের পার্থক্য বুঝা যায় না।

দ্বিতীয় — মধ্যাবস্থা, যাহাতে মনুষ্যের ধীশক্তির আভ্যন্তরিক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া তাহাকে পশু জাতি হইতে অনেকটা পৃথক করিয়া দেয়।

তৃতীয় — বিশিষ্ট মানবাবস্থা, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি তাহাকে পশুজাতি হইতে এরূপ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, যে কোনও কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত যে তদ্দ্বারা মানবজাতি মনুষ্যরাজ্য বলিয়া এক বিশেষ রাজ্যের দাবী করিতে পারে।

ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশে মানুষের এই তিনটি অবস্থা তিনটি স্তরে পরিস্ফুট হয়। সাধারণতঃ যৌবনে তাহার পাশব প্রবৃত্তি সকল সাতিশয় প্রবল থাকে, এই সময় চিন্তার পাণ্ডুর ছায়াপাতে তাহার মন বিশেষ অসুস্থ হয় না; প্রৌঢ়ত্বে বুদ্ধি শক্তির

উৎকর্ষে পাশবিক অবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক হয়; এবং বার্দ্ধক্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে পাশব অবস্থা হইতে একেবারে পৃথক হইয়া যায়।

ব্যক্তিগত উন্নতির ক্রমাভিষিক্ত পদ্ধতির সহিত ব্যক্তিসমষ্টির, অর্থাৎ সমাজরূপ জীবের, ক্রমাভিব্যক্তির বিশেষ সাদৃশ দেখা যায়। পুরাকাল হইতে যত সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উহাদের ক্রমবিকাশে ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের ন্যায় তিনটি প্রধান স্তর দৃষ্টি হয়।

সভ্যতার প্রথম স্তরে মনুষ্যসমাজ তাহার পাশবিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত থাকে, এই জন্য লৌণ্ঠনিক ও সামরিক প্রবৃত্তি তখন বলবতী। যে সকল শিল্পের দ্বারা জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও বিলাস বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শিল্প এই সময়ে আবিষ্কৃত ও পুষ্ট হয়। এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি এবং জীবনের পাশব প্রয়োজনের চরিতার্থতা, কিম্বা চিত্তবৃত্তির আলোচনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায়, কবিতা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পেব বিকাশ হয়, এবং এই কারণে সভ্যতার প্রথম স্তরকে কলাশিল্পের স্তর বলা যাইতে পারে। এ স্তরে শিল্পকলাগুলি বস্তুতন্ত্র (realistic) হইয়া থাকে; দর্শনশাস্ত্র একেবারে নাই, বিজ্ঞানের মধ্যে কেবল জ্যোতিষবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার কথঞ্চিত উন্নতি হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মনুষ্যজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই বিশ্বাস হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং কলা ও শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য যন্ত্রশাস্ত্র অনুশীলিত হয়। ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে বস্তুগত, এবং প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের ও রণনৈপুণ্যের জন্য প্রখ্যাত শূরবৃন্দের উপাসনায় পর্য্যবসিত থাকে। ধর্ম্মভাবের প্রসার ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মিক উন্নতি বড় বেশী হয় নাই। ইন্দ্রজাল, মোহিনী বিদ্যা ও ডাকিনী বিদ্যায় বিশ্বাস প্রবলভাবে বিস্তৃত থাকে। যে সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন এবং পাশববল যেখানে উচ্চতম সমাদর লাভ করে, ও জনসাধারণ ইন্দ্রিয় সুখ ভিন্ন অন্য সুখের সম্মান জানে না, সে সমাজে বিশেষ নৈতিক উন্নতির আশা করা যায় না।

সভ্যতার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্ত্তী স্তরকে বুদ্ধিবৃত্তির বা মানসিক উন্নতির স্তর বলা যাইতে পারে। তখন আর মনের উপর জড়জগতের ততটা প্রভুত্ব থাকে না, যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নিয়মের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। তখন মানব জাতি কেবল তাহার পাশব জীবনের জন্যই ব্যস্ত থাকে না, তাহার জীবনানুভূতি প্রশস্ত হয়; সে প্রাকৃতিক ও মানসিক ঘটনাবলীর কারণ ও নিয়ম অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতে যত্ন করে। এইরূপে বিজ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়। কবিত্ব এখন অর্দ্ধসভ্য শূর ও দেবগণের রণকৃতিত্ব বর্ণনা ছাড়িয়া মার্জ্জিত বুদ্ধির ও নৈতিক জ্ঞানের উপযোগী নাটক ও মহাকাব্য প্রণয়নে ব্রতী হয়। সমরপ্রিয়তা ও লুণ্ঠনশক্তি সাধারণতঃ প্রশমিত হইতে আরম্ভ হয়। এ স্তর যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই জনসাধারণ পশুবলের অপেক্ষা বিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমাদর করিতে শেখে, পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর অপেক্ষা ইহাতে

মনুষ্যত্ব ও আত্মসংযম বাড়িয়া যায়। প্রথম স্তরে ভগবৎ সম্বন্ধে যে মনুষ্যকেন্দ্রীভূত ধারণা ছিল, তাহার সহিত এ স্তরেব যুক্তিমূলক প্রকৃতির কোন সঙ্গতি হয় না, চিন্তাশীল শিক্ষিত শ্রেণী হয় কোন না কোনও প্রকারের একেশ্বরবাদের নয় অজ্ঞানবাদের (Agnosticism) কিম্বা নাস্তিকতার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে।

তৃতীয়স্তরে, পাশব জীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি, বাহ্যজীবন অপেক্ষা আভ্যন্তরিক জীবনের প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে বহির্জগতের পরিবর্ত্তে অন্তর্জগতে, এবং আত্মতৃপ্তি ছাড়িয়া আত্মসংযমে সুখসন্ধানেব ইচ্ছা বলবতী হয়। যে সব শিল্পকলা শরীরের সুখ ও বিলাস সাধন করে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সে সকলের প্রতি বড় একটা মনঃসংযোগ করেন না। উন্নত শ্রেণীর কাছে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে মানসিক ব্যাপার হইয়া পড়ে, এবং অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও কতকটা এইরূপই হয়। উন্নত শ্রেণীর লোকে স্বার্থদমন ও পরার্থপরতাকে জীবনের নিয়ম স্বরূপ করিয়া লন। সাধারণ লোকের মধ্যেও স্বার্থত্যাগ ও দয়া অভূতপূর্ব্ব প্রসার লাভ করে। যে সমর ও লুণ্ঠনপ্রিয়তা দ্বিতীয় স্তর হইতে সাধারণতঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখন অধ্যাত্ম পথে উন্নত ব্যক্তিদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, সাংসারিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধায়ক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, এবং সমাজের গতিশীলতার হ্রাস ও স্থিতিশীলতার বৃদ্ধি হয়।

মানবোন্নতির ক্রম ধারাবাহিক নহে। ঐ উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠসহস্র শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে মিশর, ব্যাবিলন ও চীনের প্রাথমিক সভ্যতার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক খৃঃপূঃ দুই সহস্র বৎসর হইতে সাতশত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে মিশর ও চীনের পরবর্ত্তী সভ্যতার, এবং ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম, এসিরিয়া, ফিনিসিয়, ও পারস্য দেশের সভ্যতার উত্থান হয়। আমরা এখন তৃতীয় যুগে। এই যুগ আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় (যাহাকে পাশ্চাত্য বলা যায়) সভ্যতার অভ্যুদয় ও উন্নতি এই যুগের মুখ্যতম ঘটনা।

ক্ষুদ্রতম বিষয়ের সহিত বৃহত্তম তুলনা করা যদি বাতুলতা না হয়, তাহা হইলে সভ্যতার যুগ বিভাগের সহিত ভূতত্ত্বের যুগ বিভাগের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতত্ত্বিক যুগ যেরূপ ভৌগোলিক ও জৈবিক পরিবর্ত্তন দ্বারা সূচিত হয়, সেইরূপ সভ্যতার প্রত্যেক যুগ কোনও না কোন বিশেষ জাতীয় বা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অনধিকারপ্রবেশী বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক মিশর, চ্যালডিয়া ও চীনের আদিম নিবাসিগণের পরাজয় হইতে প্রথম যুগের সূত্রপাত। এই যুগ প্রধানতঃ সিমীয় আধিপত্যের কাল। দ্বিতীয় যুগে সিমীয় এবং অন্যান্য অনার্য্য

জাতিকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস, পারস্য, প্রভৃতি দেশে আর্য্য জাতির কয়েকটি শাখা তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে শর্ম্মণ জাতিপুঞ্জ দ্বারা রোম সাম্রাজ্য জয়, সপ্তম ও অষ্টম খৃষ্টাব্দে আরব্য জাতির আফ্রিকা, সীবিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষে প্রবেশ, সপ্তম শতাব্দীতে টলাটকগণ কর্ত্তৃক মেক্সিকো বিজয় এবং নবম ও দশম শতাব্দীতে পেরুতে ইনকাগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনাবলী হইতে মানব সভ্যতার তৃতীয় যুগের সূচনা।

আবার মানবোন্নতির পর্য্যায়ের সহিত পৃথিবীর জীবসঙ্ঘের উন্নতির পর্য্যায় তুলনা করিয়া দেখিলে, উপরি উক্ত সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠতব মনে হয়। যেরূপ পৃথিবীময় Tertiary যুগের ভূপঞ্জরে একই প্রকৃতির জীব লক্ষিত হয়, যেরূপ আদিম প্রস্তরান্তযুগের প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সকল স্থানেই একই ধবনেব, যেরূপ নব প্রস্তরান্তযুগের মৃত মনুষ্যের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তব নির্ম্মিত স্তম্ভাদি সর্ব্বত্র একই রকমের, সেইরূপ সভ্যতার প্রত্যেক যুগের শৈল্প, মানসিক বা নৈতিক উন্নতির পবিচায়ক সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, তক্ষণ এবং সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা একই প্রকাব দৃষ্ট হয়। প্রথম যুগের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সহিত মিশরের ও চীনের সভ্যতার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে মিল দেখা যায। ব্যাবিলন মিশরের নিকটবর্ত্তী, এইজন্য এক দেশের চিন্তাফল ও রীতিনীতি অন্য দেশে আনীত হইয়াছে, এই দুই দেশ সম্বন্ধে ঐ সাদৃশ্যের এই প্রকার ব্যাখ্যান সম্ভবপর হইতে পাবে। কিন্তু চীন ও ব্যাবিলোনীয়ার মধ্যে ব্যবধান এত বিস্তর ও বাহ্য অন্তরায়সমূহ সেই সুদূরযুগে এত দুর্লঙঘ্য ছিল, যে ইহাদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যান আদৌ সমীচীন নহে।

দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয় অর্থাৎ মানসিক উন্নতির স্তরের গ্রীক চিন্তাপ্রণালী অনেক বিষয়ে সেই সময়কার ভারতবর্ষীয় চিন্তাপণালীর সদৃশ, এবং এই দুই দেশের সংসর্গ এত বেশী ছিল না যে কেবল ঐ সংসর্গ দ্বারা এই সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। দ্বিতীয় সভ্যতার অনেক বিষয়ে এরূপ আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়, যে কেহ কেহ মনে করেন যে সেই সময়ের চীনের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক লাউৎসে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং সেখানকার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

এক সময়ের সভ্যতার সহিত অন্য সময়ের সভ্যতার তুলনা অবশ্য অতি সাবধানে করিতে হয়। যেরূপ ভৌতত্তিক কোন যুগ বা অন্তর্যুগের জীবাবশেষ পরবর্ত্তী যুগ বা অন্তর্যুগের ভূপঞ্জরে কখন কখন আনীত হইতে পারে, সেইরূপ এক সময়ের সভ্যতার সাহিত্যাদির অবশেষে, পরবর্ত্তী সময়ে গৃহীত হইতে পারে, যেমন দ্বিতীয় যুগের যাবনিক ও হিন্দু সভ্যতার মানসিক উৎকর্ষের ফল তৃতীয় যুগের প্রথমস্তরের সারাসেনগণের সাহিত্যে নিহিত রহিয়াছে।

যেমন পৃথিবীর এক অংশের ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় কোন কালের জীবসঙ্ঘ অন্য অংশের সেই কালের জীবসঙ্ঘের সহিত ঠিক সমসাময়িক না হইতেও পারে, সেইরূপ সভ্যতার

কোনও যুগে একদেশে যে সকল ফলাফল প্রসূত হইয়াছে, তাহারা অপর দেশে সেই যুগের প্রসূত ফলাফলের সহিত ঠিক সমসাময়িক না হইতেও পারে, যথা — সভ্যতার দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ মানসোন্নতির পর্য্যায়ে, গ্রীসে খৃঃপূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পর্য্যায় দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেই প্রাচীন উপনিষদ রচনার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ যুগের তৃতীয় বা নৈতিক পর্য্যায় ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের সময় হইতে, চীনে লাউৎসে ও কনফিউসিযসের সময় হইতে, পারস্যে জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্ম প্রচারের সময় হইতে প্রায একই সময়ে আরম্ভ হয়। কিন্তু গ্রীসে ইহার আরম্ভ সক্রেটিসের সময়ে, অর্থাৎ একশত বৎসর পরে। আবার এই নৈতিক উন্নতির প্রাবল্য ও স্থায়িত্ব নানাদেশে নানাবিধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালস্থাযী ও বিশিষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

সমাজতত্ত্বের উপকরণ এত জটিল, এবং ঐ উপকরণ যে সকল লেখাদিতে পাওয়া যায় তাহা এত অসম্পূর্ণ, এবং ঐ লেখাদির অভ্রান্ত ব্যাখ্যা কবা এত দুরূহ, যে কোন জন সমষ্টি কোন সময়ে সভ্যতার এক স্তব হইতে উচ্চতর স্তরে উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা অধিকাংশস্থলে অত্যন্ত কঠিন। যে সমাজ অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে অথবা সভ্যতার নিম্নস্তরে উঠিয়াছে, তাহাতেও অসাধারণ মানসিক ও নৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অভ্যুদয় হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু তাঁহারা নিজ সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় সমাজে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। আদিম প্রস্তর যুগে এমন ধীশক্তিশালী শিল্পী জন্মিয়াছিল যাহাদের শিল্পকার্য্য এখনকার সেই শ্রেণীর শিল্পকার্য্যের সহিতও তুলনা করা যায়। কিন্তু এরূপ ঘটনা এত বিরল যে, তাহারা যে সমাজে বাস করিত সেই সমাজ যে কলাশিল্পসূচিত সভ্যতার প্রথমস্তরে উন্নীত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ঋগ্বেদের সময়, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যখন সভ্যতার প্রথম স্তরে ছিলেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহারা পরবর্ত্তী স্তরগুলির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন। তাই বলিয়া বলা চলে না, যে সেই সময়কার সমগ্র ভারতবর্ষীয় আর্য্য সমাজ তত্তৎস্তরে উন্নত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভারতে গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক এবং গ্রীসে সক্রেটিস কর্ত্তৃক সভ্যতার তৃতীয় (অর্থাৎ নৈতিক) স্তর সূচিত হয়। কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ কারণে, ঐ কথায় আপত্তি হইতে পারে। একদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পূর্ব্বেই উপনিষৎ রচয়িতৃগণ ও পাইথাগোরাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং অপর দিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ ও সক্রেটিস যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে বিশেষ ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। প্রথমোক্ত তর্কপ্রণালীর দ্বারা আমরা তৃতীয় স্তরের সূত্রপাতের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাতে উহার সময় পশ্চাৎবর্ত্তী হয় এবং দ্বিতীয় তর্কপ্রণালীর দ্বারা উহার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। স্থূল কথা সমাজ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ

করিলেও উহাতে প্রথম স্তরের জনসংখ্যা বেশী দেখা যায়; ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে যাহারা অসভ্য দশার একটু উপরে উঠিয়াছে মাত্র; এবং তত্রত্য উন্নত ব্যক্তিরা সমাজকে যে পথে চালাইতে চাহেন, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত পথে উহাকে লইয়া যাইতে চায়। সভ্য সমাজে সর্ব্বদাই এই রূপ বিরোধী শক্তিপুঞ্জের ক্রিয়া চলিতেছে এবং তৎপ্রসূত সামাজিক ঘটনাবলীর বিবিধত্ব এবং জটিলত্ব এত মতিভ্রমজনক যে এই সংঘর্ষণজাত শক্তির গতি নির্দ্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

একটি সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করা প্রয়োজন যদ্দ্বারা এরূপ বিষম সমস্যার কোনরূপ মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের কোন সমাজের ধীশক্তি বা নৈতিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেবা যাবৎ সমগ্র সমাজের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন যাহাতে সমাজ সমষ্টির জীবনে ও কার্য্যে তাঁহাদের শিক্ষা অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ কোনও সমাজকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে উন্নত বলা যায় না। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সমাজে মানসিক উন্নতির প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে। উহা যে দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী স্বার্থশূন্য অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহাদের জীবনে নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। কিন্তু সমগ্র সমাজে তাঁহাদের প্রভাব এতই কম যে ইহাতে সামরিক ও লৌণ্ঠনাদি প্রথমস্তরোচিত পাশব প্রবৃত্তি সকল অদ্যাপি সাতিশয় বলবতী। বস্তুতঃ দ্বিতীয় স্তরোত্থিত সমাজে সাধারণতঃ ঐ সকল প্রবৃত্তির যেরূপ লাঘব হইবার কথা, তাহা না হইয়া কোন কোন বিশেষ কারণে বরং উহাদের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে যাহা কেবল অসভ্য সমাজে লক্ষিত হয়। আমরা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছি তাহা অবলম্বন করিলে পাশ্চাত্য সমাজে অনেক সাত্বিক মহাপুরুষের অস্তিত্ব সত্ত্বেও উহাকে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ স্তরে স্থান দেওয়া যায় না।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে কখন সভ্যতার কোন যুগের বা স্তরের আরম্ভ বা শেষ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কাজেই তাহা অনেকটা অনুমান সাপেক্ষ। যে সকল লেখাদি হইতে ঐ সময় নিরূপণের উপকরণ সংগৃহীত হয় সাধারণতঃ তাহা এত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও অবিশ্বাস্য যে ঐ সময়গুলি নির্দ্দিষ্ট সময়গুলির সন্নিকট হইবে ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না।

যেরূপ কোন ব্যক্তি সহস্র সুবিধা সত্ত্বেও বাল্যকালে বা পৌগণ্ডে প্রৌঢ়ত্বের বুদ্ধির পরিপক্কতা, অথবা প্রৌঢ়ত্বে বার্দ্ধক্যের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না সেইরূপ ব্যক্তি সমষ্টিবও পক্ষে সভ্যতার প্রথম স্তরে দ্বিতীয় স্তরের মানসিক উন্নতি, অথবা দ্বিতীয় স্তরে তৃতীয় স্তরের নৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে সারাসেনদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি হিন্দু এবং গ্রীকদিগের সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের ভক্ত হইয়াছিল। তাহারা দর্শন, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রাদির অনেকগুলি সংস্কৃত ও গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে বোগদাদ, কায়রো

ও অন্তলেসিয়া তখনকার সভ্যতার কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সারাসেন সমাজ তখনও সভ্যতার প্রথম স্তবে অবস্থিত ছিল, যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তাহারা দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হইয়াছে। তাহাদের মানসিক উন্নতি প্রধানতঃ কলাবিদ্যায় পর্য্যবসিত ছিল, এবং কবিত্ব ও ভাস্কর্য্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাহারা অতি সামান্যই মৌলিক রচনা বা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানে তাহারা মাত্র ভারবাহী হইয়া ভাবতীয় ও গ্রীক সভ্যতার কতকগুলি অমূল্য আদর্শ তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট উপস্থাপিত করিযাছে।

ইউরোপের অসভ্য জাতিগণ সভ্যতার বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে গত যুগের প্রাচ্য সভ্যতার উচ্চতম স্তরের একটী উৎকৃষ্ট ফল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাবা যে ঐ স্তরে উন্নত হইয়াছিল তাহা নহে। তাহারা খৃষ্টধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। উহা তাহাদের প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে নাই, এবং যদিও তাহারা নামে উহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি বহুদিন যাবৎ তাহারা সভ্যতার প্রথম স্তরেই থাকিয়া গিয়াছিল। তাহাদের প্রকৃতিতে খৃষ্টান ধর্ম্মের পরার্থপরতা, কারুণ্য ও দয়শীলতার কোনও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তজ্জন্যই তৎকালীন খৃষ্টানমণ্ডলীব শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরাও য়িহুদী প্রভৃতি অখৃষ্টান ও স্বাধীনচেতা লোকদিগের প্রতি বিবিধরূপে বীভৎস অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না দেখা যায়।

অন্যান্য জৈবিক সংস্থানের ন্যায় সভ্যমানবেও স্থিতি বিধানের নিয়ম এই যে জীব যত উন্নত তাহার বাসস্থান সেই পরিমাণে সংকীর্ণ। আদিম প্রস্তর যুগের মনুষ্যাপেক্ষা নব প্রস্তরযুগের মনুষ্য উন্নত এবং তাহার বাসস্থানও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। সভ্যমানবের বাসস্থান আরও সংকীর্ণ। পুরাকালের সভ্যতা উত্তর ভূগোলার্দ্ধের কতিপয় স্থানে আর্য্য, সিমীয় ও মঙ্গোলীয় এই তিনজাতীয় কয়েকটী শাখার ভিতরে আবদ্ধ ছিল। পৃথিবীতে যত সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রথম সোপানের উপর উঠে নাই, এবং যাহারা দ্বিতীয় সোপানে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল ৪/৫ টি সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিতে পারিয়াছিল। ইহার কারণ কি ?

পশুগণ তাহাদের শারীরিক অভাব ব্যতীত অপর কোনও অভাবের বিষয় চিন্তা করে না এবং যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে তাহা হইলে এক এক শ্রেণীর পশুর অভাব চিরকাল অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। কিন্তু আদিম কাল হইতেই মনুষ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্খা লক্ষিত হয়। এই আকাঙ্খা হয় শারীরিক বা বাহ্যজীবনের অভাব, নয় আত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক জীবনের অভাব সম্বন্ধে প্রকাশ প্রায়। এই দ্বিবিধ আকাঙ্খাই মানবোন্নতির মূল কারণ। ইহার মধ্যে বাহ্য জীবনের অভাব মোচনাকাঙ্খা সকল জাতিরই মধ্যে বর্ত্তমান; কিন্তু সকল জাতিতে

সমানভাবে থাকে না। ইতিহাসে র আরম্ভ কালে ঐ আকাঙ্খা কেবল এশিয়ার সিমীয় আর্য্য এবং মঙ্গোলীয় জাতির কয়েকটি শাখাতে সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ছিল। বহুযুগ ব্যাপিয়া অন্যান্য আদিম নিবাসিরা নীল, য়ুফ্রেটিস, গঙ্গা এবং পীত (Yellow) নদীব উর্ব্বর উপকূলে বাস করিয়াও সভ্যতার প্রথম স্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই, কারণ তাহাদের মধ্যে ঐ আকাঙ্খা ক্ষীণভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ঠিক এই সকল স্থলেই সিমীয়, আর্য্য ও মঙ্গোলিয় জাতির শাখা গুলির মধ্যে ঐ আকাঙ্খা অপেক্ষাকৃত অধিক বলবতী ছিল বলিয়া তাহারা আপন আপন সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যেরূপ সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে অল্পসংখ্যক জাতিতে বাহ্যিক জীবনের উন্নতির আকাঙ্খা সমধিক বলবতী দেখা যায় সেইরূপ আবার এই সকল জাতিব মধ্যে আরও অল্প সংখ্যার মধ্যে আভ্যন্তরিক জীবনের উন্নতির আকাঙ্খা লক্ষিত হয়। তজ্জন্য অধিকাংশ জাতিরই প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্খা সভ্যতার প্রথম, অথবা দ্বিতীয় স্তরেই পর্য্যবসিত হয়, যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে তাহাদের সংখ্যা অতিশয় কম। ধনসঞ্চয়, বিলাসিতা, সুখস্বচ্ছন্দাদি সাংসারিক উন্নতি বা শারীবিক সুখের আকাঙ্খা যে পথে চরিতার্থ হয়, নৈতিক উন্নতির আকাঙ্খা হইতে তাহা বিভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে কতকটা বিপরীত প্রথাবলম্বী। পাশবিক জীবনেব অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) যন্ত্রবিদ্যা শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতির প্রয়াসকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। কিন্তু সভ্যতার উচ্চতম ফলস্বরূপ যথার্থ নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে ঐরূপ সংগ্রামের কার্য্যকারিতা নাই। সভ্যতার উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিস্তরে পাশবিক জীবন সংগ্রাম নিয়মের বিপরীত ভাগ পরিস্ফুট হয়। তখন ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে সমষ্টিতে জাতিতে জাতিতে অবিরাম বিরোধের অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূরে থাকুক যাহারা দুর্ব্বল ও নিঃসহায় তাহাদের বলবান ও শক্তিশালী লোকের কবল হইতে এমনকি কখনও কখনও পশুদেরও মনুষ্যের কবল হইতে রক্ষা করা হয়। তখন নিঃস্বার্থপরতা দয়াধর্ম্ম এতদূর প্রসৃত হয় যে অনেকে দৈহিক সুখসচ্ছন্দতা ও পার্থিব লাভের কামনা একেবারে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল, অধিকাংশ মনুষ্য পার্থিবোন্নতি লহযাই ব্যস্ত থাকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী হয়। তাহাবা জাতায় জীবনের মঙ্গলের জন্য, অর্থের, শিল্পের, অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজন সহজেই বুঝিতে পারে। কিন্তু তৎপক্ষে পার্থিবোন্নতির বিরোধী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সার্থকতা অতি অল্প লোকই বুঝিতে পারে। এই জন্য অতিশয় অল্পসংখ্যক সমাজ সভ্যতার উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইয়া থাকে।

কেন যে জগতের কতিপয় জাতিমাত্র, সকল জাতিতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত উন্নতির

প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছে এবং সেই উন্নতির গুণ ও মাত্রাই বা কেন এত বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে এ প্রশ্ন উঠিলে, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ববিধ জ্ঞানের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইলেও, মনুষ্যের অসম্পূর্ণতার কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শারীরিক ও অশারীরিক, বংশানুক্রম, অপারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সংস্থান এ বিষয়ের কতকটা মীমাংসা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বড় বেশী নহে। মানব যেমন কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারা উদ্ভিজ্জ ও পশুজগতের উন্নতি বিধান করে, মানব সভ্যতার উন্নতিও অনেকটা সেই ভাবেই হয়। কেবল এক্ষেত্রে মানবের কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে এমন এক দৈবশক্তির কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে হইবে, যে শক্তি মানবোন্নতির ক্রমবিকাশকে কোনও এক উদ্দেশ্যে চালিত কবিতেছে, যাহার তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে।

সভ্যসমাজের স্থায়িত্ব

পুরাকালে যে সমস্ত সভ্যতার আবির্ভাব হইযাছিল, তন্মধ্যে দুইটী মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখা যায় - ভারতবর্ষের ও চীনের সভ্যতা। অন্যান্য দেশের সভ্যতার বিনাশের পরও এই দুই সভ্যতা কেন জীবিত রহিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে কিরূপ অবস্থায় ঐ স্থায়িত্ব ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু সভ্যতালোপের ও সভ্যতার স্থায়িত্বের উদাহরণ এত অল্প যে তাহা হইতে কোন নির্দোষ সাধারণ মত স্থাপিত করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত নহে। তথাপি যদিও ইহার চূড়ান্ত মীমাংসার আশা করা যায় না, বিষয়টি এত গুরুতর যে এরূপ চেষ্টা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

একটি গুরুতর বিষয়ে চীনের ও ভারতের সভ্যতার ঐক্য এবং অন্যান্য সভ্যতার সহিত অনৈক্য ছিল। উভয়েই তৃতীয় স্তরে এতটা উন্নত হইয়াছিল যে উহারা পার্থিব বা লৌকিক ও নৈতিক বা অলৌকিক উন্নতিবিধায়ক শক্তি সমূহের মধ্যে সাম্য স্থাপন করিতে এবং ঐ সাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কনফিউসিয়স ও লাউৎসের সময় হইতে চীন নীতিতে দয়া, পরোপকার প্রভৃতি গুণ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কনফিউসিয়স শিখাইয়াছেন, "যে ব্যবহার নিজে পাইতে চাহ না, পরের সহিত তেমন ব্যবহার করিও না," এবং লাউৎসে, গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি মনীষীর ন্যায় শিখাইয়াছেন, "যে তোমার অপকার করিয়াছে, তাহার উপকার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিও"। অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনে এবং ভারতবর্ষে প্রজাসাধারণের উপকার করাই রাজ্যের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেও ধন সম্পত্তিকে কখনও সমাজ মর্য্যাদার মানদণ্ড করা হয় নাই। উভয় দেশেই জনসাধারণ দ্বারা পুণ্য ও উচ্চজ্ঞান যেরূপ সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোনও দেশে হয় নাই। মহাত্মাদিগের পূজা যেরূপ ভারতবর্ষে সেইরূপ চীনেও ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। তৃতীয় স্তরে উন্নীত হইলে চীনা এবং হিন্দুরা

যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান জ্ঞান ও নীতিচর্চ্চায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের নিম্নে রাখিয়া ছিলেন। চীনে সামাজিক মর্য্যাদা পর্য্যায়ে সৈনিক সর্ব্ব নিম্নস্তরে। নরপতি সমাজে বোধ হয় একমাত্র চীনের সম্রাটই তরবারি ধারণ করেন না। যুদ্ধনিপুণতাই যাঁহাদের খ্যাতির একমাত্র কারণ চীনে এবং ভারতবর্ষে তাহারা, ঐ দুই দেশের সভ্যতার তৃতীয় স্তরে উন্নীত হওয়া অবধি, কখনও বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই।

স্বার্থশূন্যতা, পরোপচিকীর্ষা, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তির প্রশমন প্রভৃতি গুণে ভারত ও চীনে যেরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ যে সকল সভ্য সমাজ বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদের সহিত অনৈক্য দৃষ্ট হয়। গ্রীস সভ্যতার তৃতীয় স্তরে উঠিয়াছিল, কিন্তু উহাতে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রীক সমাজে ধন সম্পত্তি এবং রণ নৈপুণ্যের যেরূপ সম্মান ছিল উচ্চজ্ঞান বা নীতিচর্চ্চার সেরূপ ছিল না। পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীসের অধিকাংশ মহাপুরুষেরা বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, কেহ কেহ নির্ব্বাসিত, কেহ কেহ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভারতে এবং চীনে মহাত্মাদিগের যেরূপ সমাদর ছিল, গ্রীসে তাহার কিছুই ছিল না। গ্রীসের নৈতিক ভাবের মধ্যে প্লেটো কর্তৃক অভিব্যক্ত এই চারিটি মুখ্য গুণের উপর — বিজ্ঞতা, সাহস, অপ্রমত্ততা এবং ন্যায় — আরিষ্টটলের গুণাবলী স্থাপিত। দুইটির কোনটিতেই সার্ব্বজনীন প্রেমের ত কথাই নাই, নিজ জাতি সংশ্লিষ্ট সংকীর্ণ দয়ারও স্থান নাই। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঐ দেশে দরিদ্র ও ধনবানে, নিম্নশ্রেণীতে ও উচ্চশ্রেণীতে অবিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। গ্রীসে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির এত উৎকর্ষ হয় নাই যে উহাদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতি স্থাপন করিতে পারে। তিন শতাব্দী ধরিয়া ইহারা পরস্পরকে ঘৃণা ও পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন নিম্ন শ্রেণী ক্ষমতাপন্ন হইত, তখন তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোকগুলিকে হয় নির্ব্বাসিত করিত নয় তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত। আবার যখন উচ্চ শ্রেণীর কাছে ক্ষমতা ফিরিয়া আসিত, তখন তাহারাও নিম্নশ্রেণীর সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা করিত। এইরূপে ক্রমাগত জাতীয় সংহতির ক্ষয় হইত এবং তজ্জনিত আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতাই গ্রীক সভ্যতার অবসানের কাবণ হইয়াছে। গ্রীস যদি ভারত ও চীনের ন্যায় ঐক্যময় সভ্যতা স্থাপন করিতে পারিত, যদি তাহার সভ্যতার লৌকিক ও আত্মিক উপাদানগুলিতে সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে উহা তাহার স্বাধীনতার সহিত বিনষ্ট হইত না।

অতিরিক্ত অনাত্মবাদের বিষময় ফল রোমের ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান। গ্রীকদিগের অনুকবণ করিয়া রোম দ্বিতীয় অর্থাৎ মানসিক উন্নতির স্তরে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় স্তরে পদার্পণও করিয়াছিল এরূপ বলা যায় না। রোম নিরতিশয় ঐহিকতায় নিমগ্ন ছিল। রোমের জনসাধারণের পাশব প্রবৃত্তি কিরূপ বীভৎস ছিল তাহা রোমক সাম্রাজ্যের সকল প্রধান নগরীর রঙ্গভূমিতে নিষ্ঠুর ক্রীড়া

প্রদর্শনেই সুব্যক্ত। কখনও কখনও রঙ্গভূমিস্থ হিংস্র জন্তুগুলিকে সশস্ত্র লোকের সমক্ষে না ছাড়িয়া দিয়া, উলঙ্গ ও আবদ্ধ লোকের উপর ছাড়িযা দেওয়া হইত। এই কদাচার সাম্রাজ্যের সমস্ত নগরীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যগণকে জনসাধারণের আমোদের জন্য ঐরূপ ক্রীড়া প্রদর্শনে বাধ্য করা হইত। এইরূপে স্ত্রী পুরুষ ও বয়ঃক্রম নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক হিংস্র পশুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইত। কিন্তু রোমের জাতীয় আমোদ ছিল, গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ। সশস্ত্র মনুষ্যগণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমরণ যুদ্ধ কবিত। অগষ্টস তাঁহার জীবিতকালে দশ সহস্র গ্লাডিয়েটরকে যুদ্ধ করাইয়া ছিলেন, এবং ট্রোজান চারিমাসেই ঐ সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

অর্থ ও ক্ষমতা পাইয়া রোমের জনসাধারণ নিতান্ত ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বিধিব্যবস্থার কোনও মূল্য ছিল না, কোনও বিচারার্থীকে পূর্ব্বে উৎকোচের ব্যবস্থা করিয়া তবে বিচারের আশা করিতে হইত। সমাজ অতিশয় কলুষিতও হইয়াছিল। রোম নগরী নরকতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হত্যাকাণ্ড, পিতা, মাতা, পতি, পত্নী, বন্ধু সকলকেই প্রতারণা, বিষ প্রয়োগ, পরদারহরণ, অগম্যাগমন ও অন্যান্য অকথ্য পাপ - ফলতঃ মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি প্রসূত যত প্রকার কদাচার হইতে পারে তাহার কোনটাই অনাচরিত ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেবা এতদূর লালসাময়ী, ভ্রষ্টাচরিত্রা এবং ভয়ঙ্করী হইয়াছিল, যে কোনও পুরুষকে উহাদের বিবাহ করিতে স্বীকৃত করা অসম্ভব হইয়াছিল। অবৈধ সহবাস বিবাহের স্থল অধিকার করিয়াছিল, এবং অবিবাহিত কন্যাগণ অভাবনীয় নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিত। ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছিল, যে সিজার বিবাহের পুরস্কার ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহু সন্তানবতী বিবাহিতা রমণীকে তিনি পুরস্কৃত করিতেন, এবং ৪৫ বৎসরের নিম্নবয়স্কা ও সন্তানহীনা স্ত্রীগণকে অলঙ্কার ধারণ করিতে, শিবিকা রোহণে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বিধি ব্যবস্থাতেও উপরিউক্ত কদাচারনিচয় নিরাকৃত হওয়া দূরে থাকুক বরং এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে অগষ্টস যখন দেখিলেন, কেহ আর বিবাহ করিতে চাহে না এবং জনসাধারণ ক্রীতদাসীর সহিত অবৈধ সহবাসই ভালবাসে, তখন তাহাকে অবিবাহিতের উপর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, এবং তিনি এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে কেহ আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহারও বিষয় উইল সূত্রে পাইতে পারিবে না। ইহাতেও যে রোমের রমণীরা লালসা পরিতৃপ্তি করিতে বিরত তাহা নহে, তাহাদের নষ্টচরিত্র তাহাদিগকে এমন কুৎসিত কার্য্যনিচয়ে প্ররোচিত করিত যে, তাহার বর্ণনা করা আধুনিক কোনও গ্রন্থে সম্ভব নহে। কনসল পরিবর্ত্তনের হিসাবে বর্ষ গণনা না করিয়া, তাহারা বর্ষ গণনা করিত নিজেদের নায়ক পরিবর্ত্তন হিসাবে। উদারপরায়ণতা ও জঘন্য বিলাসিতার উদাহরণ রোমের ইতিহাসে ভূরি ভূরি বিবৃত রহিয়াছে। কথিত আছে রোমের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা "ভোজন করিত বমন করিবার জন্য, এবং বমন করিত ভোজন করিবার জন্য।"

রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তার ও তজ্জনিত সাংসারিক উন্নতির পরিপুষ্টি এমন কতকগুলি হেতুর সঞ্চার করিয়াছিল যাহাদের ফলে রোমক জাতি ও রোমক সভ্যতা ধ্বংস হইয়া গিযাছিল। সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়পরতার কতদূব প্রসার লাভ করিয়াছিল আমরা এই মাত্র তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যে সমাজের নৈতিক বল এত কম তাহার দীর্ঘ জীবনের আশা করা যায় না। জাতি সংরক্ষার্থ সুসন্তান প্রসব করিতে হইলে রমণীগণের সতীত্বের আদর্শ পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ হওযা প্রয়োজন। কিন্তু সেই আদর্শ রোমে নিতান্ত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের অতি বিস্তারে রোমের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার সাতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু উহাই রোমক জাতির ক্ষয়ের একটি বিশেষ কারণ। প্রতি বৎসর রোম অনেকগুলি করিয়া সুসন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিত। ইহাদের গৌরবময় বিজয়লাভের ফলে রোমের সাম্রাজ্য এবং দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু ঐ ঘটনাই রোমকগণকে নষ্ট চরিত্র করিয়া নানা রূপে শেষে রোমের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। খৃষ্টীয প্রথম শতাব্দী হইতেই স্বহস্তে ভূমিকর্ষণকারী সামান্য ভূম্যধিকারী প্রাচীন রোমকগণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদেশিক যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের চিন্তা রোম রাজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ রোমক কৃষকগণের তিরোধানের একটা প্রধান হেতু হইয়াছিল। যখন সিসিলি ও আফ্রিকা হইতে প্রচুর শস্য আসিতে লাগিল তখন আর ইটালীর সামান্য ভূম্যধিকারীরা শস্য উৎপাদনে লাভ করিতে পারিত না। তাহারা আপন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড ধনাঢ্য প্রতিবেশীগণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। জ্যেষ্ঠ প্লিনি বলিয়াছেন যে, বিস্তৃত ভূম্যধিকারীই ইটালীর সর্ব্বনাশের কারণ। বিস্তৃত ভূম্যধিকারীরা দেখিল যে ক্রীতদাসের পরিশ্রমে শস্যোৎপাদন সুবিধাজনক। তাই আর পুরাতন কৃষককুল কোন কাজ পাইত না, এবং গৃহহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। টাইবিরিয়স গ্র্যাকাস বলিয়াছেন — "ইটালীর বন্য জন্তুদেরও মাথা গুঁজিবার স্থান আছে, কিন্তু যাহারা ইটালীর জন্য নিজ হৃদয় শোণিত দিতে প্রস্তুত, তাহাদের কেবল মাত্র আলোক আর নিঃশ্বাসের বাতাস আছে — তাহারা আশ্রয়ের অভাবে স্ত্রী পুত্র সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহারা নামে পৃথিবীর অধিপতি, তাহাদের নিজস্ব এক ফুট জমিও নাই।" উচ্ছন্ন কৃষককুল চারিদিক হইতে রোম নগরীর দিকে ছুটিল। তদ্ভিন্ন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসগণের সন্তানগণও নগরী পরিপূর্ণ করিল। গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, এসিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স পৃথিবীর সকল দিক হইতে সকল জাতির লোক স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ও দাসরূপে বিক্রীত ও পরে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া নাগরিক পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে রোমক নামধারী এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইল। ইহারা নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত না। ইহাদিগকে গবর্ণমেন্ট বিনামূল্যে শস্য ও তৈল বিতরণ করিত। এই হতভাগ্য অলস ব্যক্তিগণই গবর্নমেন্টের কর্ত্তা

হইয়াছিল। ইহারাই নির্ব্বাচন দিনে ফোরম জুড়িয়া থাকিত, এবং বিধিপ্রণয়ন ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিত। ঐ সকল পদের প্রার্থিগণ আমোদজনক প্রদর্শনী ও ভোজাদিদ্বারা উহাদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিত। প্রকাশ্য দিবালোকে ভোট বিক্রয়ের বিস্তৃত আয়োজন হইত।

নৈতিক উন্নতিবিহীন সভ্যতার আর একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ আসিরিয়া। ইহা বিলক্ষণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আসিরীয়গণ রোমকদিগের ন্যায় প্রভূত পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। উহারা বর্ণবৈচিত্র্য বিশিষ্ট সূচিশিল্প সমন্বিত পরিচ্ছদ হস্তিদন্তে স্বর্ণখচিত ও খোদিত কারুকার্য্য, কাচের ও বহুবিধ ধাতুময় দ্রব্য, মূল্যবান ও মনোহর গৃহসজ্জা ও অশ্বসজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিয়াছিল এবং উহাদের প্রভুত্বের বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের নৈতিক উন্নতি এতই সামান্য ছিল যে, আসিরিয়ার রাজারা তাহাদের উৎকীর্ণ লিপিতে বারম্বার নিজেদের নিষ্ঠুরতার এরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যেন ইহা একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। একজন রাজা বলিয়াছেন, "আমি ২৬০ জন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুণ্ডগুলির স্তূপ নির্ম্মাণ করিলাম।" আর একজন বলিয়াছেন "আমি প্রতি দুইজনের মধ্যে একজনের প্রাণবধ করিলাম; নগরের বৃহৎ তোরণের সম্মুখে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া আমি বিদ্রোহী অধিনায়কগণের চর্ম্ম উন্মুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা এই প্রাচীর আচ্ছাদিত করিলাম। কতকগুলিকে জীবদ্দশায় এই প্রাচীরের সহিত প্রোথিত করিলাম কতক-গুলিকে এই প্রাচীরে ক্রসবিদ্ধ অথবা শূলবিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম।" আসিরিয়ার ইতিহাস তত্রত্য নৃপতিবৃন্দের অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত সম্পাদিত লুণ্ঠন ও বিবরণে পরিপূর্ণ। আসিরিয়ার নিষ্ঠুরতা ও রণ হত্যাদি প্রবণতা এরূপ প্রবল হইল, যে বিজিত জাতি সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইত, তাই যুদ্ধের আর বিরাম ছিল না। এই রূপে আসিরিয়া ক্রমে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে মিডিয়া নামক একটী সবল জাতি অনায়াসে তাহাকে পরাভূত করিল। ইহুদীধর্ম্মবক্তারা যাহাকে সিংহের আবাসভূমি রক্তপ্লুত নগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই নিনেভীই নগরী বিজিত ও ধূলিসাৎ হইল। ধর্ম্মবক্তা নাহুম বলিয়াছেন "নিনেভীই ধ্বংস হইয়াছে। কে তাহার জন্য শোক করিবে?"

দীর্ঘজীবী চীন ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সহিত গ্রীক, রোমক, ও আসিরীয়ের ন্যায় স্বল্পজীবি সভ্যতার নৈতিক প্রভেদ অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব প্রদর্শিত হইল, এবং ঐ প্রভেদ প্রযুক্ত ইহাদের সভ্যতার কিরূপে বিনাশ হইল তাহারও কতকটা আভাস দেওয়া গেল। সভ্যতার বিলোপ বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে উহার সঞ্চিত জ্ঞানরাশিরও উচ্ছেদ হইয়াছে। যে ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় পার্থিব উন্নতির অনুরাগী, যাহার জীবন কেবল পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সম্পদে আবদ্ধ, সে যদি

ইহাকে হারায় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জন্য রাখিয়া যাইবার আর তাহার কিছুই থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তির পার্থিব উন্নতির আকাঙ্খা, আত্মিক উন্নতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং যাহার আশা ও আকাঙ্খা পার্থিব সমৃদ্ধিতে নিমগ্ন না থাকিয়া, তদিতর আদর্শের ও অপার্থিব বস্তুর সন্ধানে ফেরে, সে পার্থিব ঐশ্বর্য্য বঞ্চিত হইলেও, নিজ অন্তরস্থ সদ্বস্তুর প্রভাবে অটুট থাকে। তাহার উন্নত জ্ঞান, তাহার ঐশ্বর্য্য বা শরীর নাশের সহিত বিনষ্ট হয় না, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জন্য থাকিয়া যায় এবং মানব জাতির উপকার সাধন করে। ব্যষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সমষ্টি সম্বন্ধে ও ঠিক তাহাই ঘটে। রোম এবং আসিরিয়ার ন্যায় যাহাদের সভ্যতা পার্থিব সম্পদ ও পরাক্রমে প্রধানতঃ পর্য্যবসিত হয়, তাহাদের উহা হারাইলে আর কিছুই থাকে না। কিন্তু কোনও জাতির পক্ষে উচ্চ জ্ঞানোন্নতিবিধায়িনী শক্তি জড় জীবনের প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন হইলেও উহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ উহারই সাহায্যে উক্ত জাতি অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক জড়জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হইলেও, নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে; এবং ঐ শক্তি সমগ্র মানবজাতির পক্ষ্যে অমূল্য, কারণ অতীত বংশাবলীর ধনসম্পত্তি বা রণনৈপুণ্য অপেক্ষা উহাদের উচ্চজ্ঞান বা নৈতিক উন্নতি দ্বারাই মানবের যথার্থ উপকার হয়।

চীনের এবং ভারতের ইতিহাসে সমাজ বিজ্ঞানের এই মূল সত্যটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। অনেকের কাছে বিরোধোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা সত্য যে চীনের সৈন্যবল বা ধনসম্পত্তি তাহার সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই। উহার নৈতিক উন্নতিই উহাকে রক্ষা করিয়াছে। চীন বহুবারই বিদেশী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে কিন্তু পরাজয় করিতে পারে নাই। চীন বিজয়ী বিদেশীগণকে নৈতিক বলে পরাভব করিতে কখনও অকৃতকার্য্য হয় নাই। স্বীয় নৈতিক শক্তির বলে বিদেশী বস্তুকে নিজেদের সভ্যতায় মিশাইয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়াই তাহার সভ্যতার স্থায়িত্ব এত সুনিশ্চিত হইয়াছে। টারটার, মোঙ্গল কিংবা মাঞ্চু সকল বিদেশী বিজেতৃগণ কিছুদিন পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে চীনের লোক হইয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই চীনের ভাষা, আচার ব্যবহার ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া কনফিউসিয়াস প্রভৃতি চীন মহাত্মাগণের ভক্ত ও উপাসক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যাবর্ত্ত তাহাদের নৈতিক উন্নতির ফলে বিজাতীয় উপকরণগুলি তাহাদের সভ্যতায় মিশাইয়া লইয়া উহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে। যখন ভারতবর্ষ তৃতীয় স্তরে উঠিয়াছিল তখন আর্য্য ও অনার্য্যগণের জাতীয় পার্থক্য অপসৃত হইয়া, ইতিহাসবিশ্রুত একই আদর্শ এবং একই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হিন্দু নামক এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় স্তরে, ভারতবর্ষ গ্রীক, পার্থিয়ান, শক এবং হুণ প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী জাতির আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল, এবং উহারা স্থানে স্থানে নিজেদের অধিকার স্থাপনেও কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উহারা

বিতাড়িত কিংবা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সাহিত্য আচার গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গ্রীক নরপতি মীনাণ্ডার খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী বুদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, এবং মিলিন্দ নামে মিলিন্দপঞহো নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। শকরাজ কুশান শিবভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কণিষ্ক ও তাঁহার পুত্র হুনক বৃদ্ধভক্ত ছিলেন। পার্থিয়ান বংশের পহলবগণ চারিশতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং সর্ব্বতোভাবে হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সময় হইতেই কাঞ্চীনগরী হিন্দুধর্ম্মের একটী পীঠস্থান স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সৌরাষ্ট্রের শক অধিপতিগণ হিন্দুধর্ম্মের হয় ব্রাহ্মণ নয় বৌদ্ধ শাখা অবলম্বন করিয়াছিল।

মুসলমান বিজয়ে হিন্দুরা অনেক স্থানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরও তাহাদের সমাজ ও সভ্যতা জীবিত ছিল, এই স্থায়িত্বের প্রধান কারণ, তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। উহাই তাহাদিগকে শস্ত্রাঘাতের ভয়ে বা পার্থিব উন্নতির প্রলোভনে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিবার সাহস দিয়াছিল। উহা যে শুধু মুসলমান বিজয়রূপ সংহার প্রবল শক্তির অদমনীয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নহে; সময়ে মুসলমান হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া মুসলমান সভ্যতার শাসন নীতির উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ ক্রমশঃ অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের অন্যধর্ম্মানুরাগ হিন্দুগণের দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে ক্রমশঃ সংযত সংহত হইয়াছিল, এবং মুসলমান ধর্ম্মের ও শাসনতন্ত্রের উপর হিন্দুর প্রভাব ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়াছিল।

আকবরের সিংহাসনারোহণ হইতে সাহাজাহানের রাজ্যচ্যুতি পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম কাল। আকবর এবং তাঁহার সুশিক্ষিত সভাসদ্ ভ্রাতৃদ্বয় ফাইজি ও আবুল ফাজল বিশেষরূপে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। আবুল ফজলকে তাঁহার সমসাময়িক অনেকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করিতেন। আকবর হিন্দুদিগের মত গোহত্যাকে পাতক বলিয়া ভাবিতেন এবং গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছিলেন। আকবরের পত্নীদের মধ্যে দুইজন হিন্দু ছিলেন, এবং জাহাঙ্গীর ইহাদের একজনের সন্তান। জাহাঙ্গীরের দশটী স্ত্রীর মধ্যে ছয়টি হিন্দু ছিলেন। এবং সাহাজাহান ইহাদের মধ্যে একজনের সন্তান। তাঁহার ধমনীতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু শোণিতই বেশী ছিল। আকবর সম্বন্ধে কথিত আছে, যে, তিনি যৌবনাবধি হোম করিতেন। গোঁড়া মুসলমান ইতিহাস লেখক বেদৌনি লিখিয়াছেন —[১] "হিন্দুদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি নিজ অদ্ভুত মতানুসারে অনেকগুলি হিন্দু আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস আপনার রাজদরবারে চালাইয়াছেন এবং এখনও চালাইতেছেন।" কেহ কেহ বলেন, আকবরের বিশেষ প্রিয়পাত্র রাজা বীরবল তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়াইয়াছিলেন। বেদৌনি বলেন যে, বীরবলের মৃত্যুতে আকবর যেমন শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন তেমন

কোনও মুসলমান ওমরাহের মৃত্যুতে হন নাই। আকবরের হিন্দুপ্রীতিমূলক নীতি গোঁড়া মুসলমানগণের হৃদয়ে যে হিংসানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা বেদায়নি প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু মানসিংহ, টোডরমল বীরবল এবং ফৈজি ও আবুল ফাজল (যাঁহারা হিন্দুর মধ্যে গণ্য), আকবরের পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট যাহা করিতে পারেন নাই, ইহারা তাহা করিয়াছিলেন। ন্যায় সঙ্গত ও উদার নীতির ভিত্তির উপরি স্থাপিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

আকবরের হিন্দু প্রীতিমূলক রাজনীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ও চলিয়াছিল। দারা ও ঔরঙ্গজীবের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উদারমতের ও সঙ্কীর্ণমতের, হিন্দু প্রীতিমূলক ও হিন্দুবিদ্বেষমূলক রাজনীতির যুদ্ধ। দারা আকবরের মতাবলম্বী ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান মতসমূহের সামঞ্জস্য করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপনিষদের পারস্যভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আকবরের মত তিনিও বিধর্ম্মী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কথিত আছে যে তিনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ যোগী ও সন্ন্যাসীদের সহিত মিশিতেন। তিনি ঈশ্বরের মহম্মদীয় নামের পরিবর্ত্তে হিন্দু "প্রভু" নাম ব্যবহার করিতেন এবং অঙ্গুরীতে হিন্দিভাষায় ঐ নাম খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দু সভ্যতার বিশেষ কোনও ক্ষতি সাধিত হয় নাই। তৃতীয় স্তরে যে নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল মুসলমান রাজত্বকালে তাহা বজায় ছিল। বারানসী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা অনেকটা পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু চলিত ভাষায় লিখিত সাহিত্যের অত্যাশ্চর্য্য পরিপুষ্টি দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে একনাম ও তুকারাম, উত্তরভারতে সুরদাস ও তুলসীদাস, বঙ্গে মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং বৈষ্ণব কবিগণ, দাক্ষিণাত্যে তিরুবল্লভের কামবর প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্নাহরণ পূর্ব্বক হিন্দুমনীষীগণের শিক্ষা লোকমধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। রামানন্দ, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য ও নানক প্রমুখ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধর্ম্মসংস্কারকগণ জন সাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ রাখিয়াছিলেন।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যে দুইটি সভ্য সমাজ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক বিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে তাহাদের সাংসারিক উপাদান নৈতিক উপাদানের অধীন; এবং যে সভ্যসমাজগুলি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এক বিষয়ে সাম্য ছিল তাহাদের সাংসারিক উন্নতির মাত্রা অনুচিত রূপে নৈতিক উন্নতির উপরে উঠিয়াছিল। অতঃ ততঃ আমরা যতটুকু সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়।

প্রথম — যে সকল সভ্য সমাজের সাংসারিক বা ভৌতিক উপকরণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উপকরণ অপেক্ষা প্রবল তাহারা ক্ষণস্থায়ী। উহাদের পিচ্ছিল বালুকারাশির উপরি নির্ম্মিত সুরম্য সৌধের ন্যায় অচিরেই হউক বা বিলম্বেই হউক পতন অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় — যে সকল ভৌতিক শক্তি সাংসারিক উন্নতি বিধান করে এবং যে সকল পার্থিবেতর শক্তি উচ্চ নীতি সংক্রান্ত উন্নতি বিধান করে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা এবং ঐ সামঞ্জস্য রক্ষা করার উপরেই সভ্যসমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এরূপ সামঞ্জস্যের জন্য প্রথমোক্ত শক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত শক্তি প্রবলতর হওয়া প্রয়োজন। কারণ মানব স্বভাবতঃ স্বার্থপর ও সাংসারিক উন্নতি বিধায়ক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রবৃত্তি মার্গেই ধাবমান হয়; নৈতিক উন্নতি বিধায়ক বিরুদ্ধ শক্তি অধিকতর প্রবল না হইলে তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণেও নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক জীবনে যে জ্ঞানে সামরিক রাজনৈতিক বা আর্থিক কার্য্যপটুতা সাধিত হয় তদপেক্ষা যে জ্ঞানে উচ্চ নৈতিক উন্নতি সাধন করে তাহার সার্থকতা অধিক। হিন্দু মহাত্মারা সমাজ বিজ্ঞানের এই মূল সত্যটী সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। উচ্চ নৈতিক উন্নতিই যে জ্ঞানানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাদের জীবনে ও সাহিত্যে বিঘোষিত। তাঁহারা সাধারণতঃ ঐহিক বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং আশ্রমের নির্জ্জনতায় দরিদ্র ভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন। গীতাতে সাত্বিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য এইরূপ ঃ-

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্তিকম্।।
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাং স্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।

জন সাধারণের মধ্যে প্রচলিত চাণক্যশ্লোকেও ঐরূপ ঃ-

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সপণ্ডিতঃ।।
ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

ভগবদ্‌গীতা, ধর্ম্মশাস্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুমনীষীদের উচ্চনৈতিক আদর্শের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতার কয়েকটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে —

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্থে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি।।
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।।
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।।
মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্তিক উচ্যতে।।

সমাজতত্ত্বের আর একটি গুরুতর বিষয়ে আমাদের মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে সমাজ যতই কেন উন্নত হউক নিম্নস্তরে উহারা অবস্থিত। অধিক সংখ্যক লোক জ্ঞানমার্গে বিশেষ অগ্রসর হইতে অক্ষম। তজ্জন্য উহাদের পক্ষে ভক্তি ও কর্ম্মমার্গ নির্দ্ধারিত করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ ও বিবিধ ব্রতাদি বিধিব্যবস্থা দ্বারা উহাদিগকে সর্ব্বভূতহিতমূলক উচ্চনীতিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজ, রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী ও পরমহংস পর্য্যন্ত আমাদের সমাজসংস্কারক মহাপুরুষদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল — পথভ্রষ্ট ভারত সন্তানদিগকে আমাদের প্রাচীন এবং প্রশস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে কি করিয়া আনা যায়। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে উন্নত সমাজের সুখ এবং স্থায়িত্বের প্রধান উপকরণ ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে এবং সমষ্টিতে সমষ্টিতে অবিরাম সংগ্রাম নহে, ঐরূপ সংগ্রাম হইতে বিরত; শারীরিক বল নহে, আত্মিক বল; জিহীর্ষা জিঘাংসা এবং যুদ্ধের ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি নহে, সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্খা, স্বার্থত্যাগ, ন্যায়পরতা এবং পরোপচিকীর্ষা।

(১৯১৬ - যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুর অভিভাষণ। — অনুবাদক জীতেন্দ্রলাল বসু।)

সভ্যতার স্তর ও যুগ

পশুদিগেব সহিত মনুষ্যেব শারীরিক সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। পশুর ও মনুষ্যেব দেহযন্ত্র সর্ব্বতোভাবে একই উপাদানে গঠিত। উচ্চশ্রেণীস্থ বানবদেহে প্রত্যেক পেশী প্রত্যেক শিবা ও প্রত্যেক অস্থি যে প্রথায় সন্নিবিষ্ট, মনুষ্যদেহেও ইহারা অবিকল সেই প্রথায় সন্নিবিষ্ট হইযাছে। অস্থিসংস্থান বিদ্যার দিক দিয়া (anatomically) দেখিতে গেলে, নিম্নশ্রেণীস্থ বানরের সহিত উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের যে সম্বন্ধ, উচ্চশ্রেণীস্থ বানবেব সহিত মনুষ্যেব সম্বন্ধ তদপেক্ষা অনেক নিকট। চিত্তবৃত্তি বিষযেও কতিপয শ্রেষ্ঠ পশুর সহিত মানুষের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়। স্নেহ, হিংসা, ঈর্ষা, ভয বা সাহস, কতকগুলি পশুতে যেমন আছে, মনুষ্য হৃদযেও সেইরূপেই বিদ্যমান। কিন্তু কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে মনুষ্যে ও পশুতে তাবতম্য লক্ষিত হয।

প্রথম — প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান একই শক্তির সাহায্যে মানুষ ও পশু চিন্তা করিযা থাকে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতদূর প্রাচীনকালেব কোনও নিশ্চিত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সেই সময় হইতেই পশুদের অপেক্ষা মনুষ্যেব বুদ্ধি এত পরিপুষ্ট যে উভয়েব মধ্যে তুলনাই হয় না। ধীশক্তি সম্বন্ধে মনুষ্যে ও পশুতে বিস্তর প্রভেদ, এবং এই প্রভেদেব সামঞ্জস্য করিতে পারে, এতদুভয়েব মধ্যবর্ত্তী এমন কোনও জীব এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি মস্তিষ্কাধার (Cranial capacity) বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আদিম প্রস্তর যুগেব মানব (Palaeolithic man) কেবল যে সর্ব্বোচ্চ পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা নহে, তাহাব আধুনিক কি সভ্য, কি অসভ্য সকল বংশধরগণের তুলনায় কোনও অংশে ন্যূন ছিল না। (লা শাপেল ও স্যাণ্ডেব নবকপাল সমূহেব মস্তিষ্কাধাবেব পবিমাণ ১৬০০ ঘন সেমি, নেয়াণ্ডারথালের ১৬২০, ক্রোম্যাগ্নো কপাল সমূহেব ১৫৯০ হইতে ১৭১৫ পর্য্যন্ত। প্যারিসবাসিগণেব মস্তিষ্কাধারেব নিম্নতম পবিমাণ ১৫৫৮ ঘন সেমি, চীনগণেব ১৫১৮, পশ্চিম আফ্রিকাব নিগ্রোগণেব ১৪৩০, এবং ট্যাস্‌মানিযাবাসিগণেব ১৪৫২, টনিপার্ড এই পবিমাণগুলি দিযাছেন। ১৯১০ সালেব জিওলজিকাল সোসাইটিব সাম্বৎসবিক উৎসব সভাব বক্তৃতায অধ্যাপক সোল্লাসে বলিযাছেন —"ঐ কপালগুলি এই তথ্যেব নির্দ্দেশ কবিতেছে যে ফ্রান্সেব আদিম নিবাসীবা মস্তিষ্কাধাব বিষযে সভ্যতম মানব অপেক্ষা উপবে বৈ নিম্নে ছিল না।"

দ্বিতীয় — আ, দ্য কাৎরফাজ প্রমুখ কতকগুলি মনুষ্যতত্ত্বজ্ঞের মতে দুইটী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের ও পশুর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশিত হয় —(১) আধ্যাত্মিক বৃত্তি — যাহা দ্বারা মানুষ অলৌকিক জীবের ও ভবিষ্যৎ জীবনের উপর বিশ্বাস করে, এবং (২) নৈতিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা মনুষ্য লাভের ও শারীরিক সুখদুঃখের অতীত নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারে। পশুদের মধ্যে এই দুই শক্তি অঙ্কুরাবস্থাতেও দেখা যায় না। আদিম মানবের এবং তাহার সমতুল্য আধুনিক অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও কিন্তু এই দুই শক্তি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসী দেশে যে কতিপয় আদিম প্রস্তরযুগের নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে মৃতব্যক্তিকে তাহার অস্ত্রাদির সহিত সমাহিত করা হইয়াছিল, এবং অন্ততঃ একটী মৃতব্যক্তির সহিত তাহার অস্ত্রাদির অতিরিক্ত একটা বাইসনের জঙ্ঘাও বোধ হয় মৃতাত্মার ভোজনের উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছিল। নব-প্রস্তর যুগের মনুষ্যগণ মৃতের সমাধির উপর আকটা আস্ত পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিত এবং মৃতাত্মাকে দান করিবার উদ্দেশ্যে সমাধির ভিতর অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্রাদি এবং অলঙ্কার নিক্ষেপ করিত।

পৃথিবীর কোনস্থানেই এখনও এমন কোন অসভ্য জাতি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার একেবারে কোনও ধর্ম্ম নাই। কতকগুলি অসভ্যজাতির ধর্ম্মবিশ্বাস তদপেক্ষা সভ্যতার অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত জাতির ধর্ম্মমতের সহিত স্বচ্ছন্দে উপমিত হইতে পারে। নিম্নপদস্থ বহু দেবতার উপরে স্থিত বিশুদ্ধ-আত্মা পরমেশ্বরের বিষয়ে টাহিটীয়গণের স্পষ্ট ধারণা আছে। তাহাদের একটি গানের আরম্ভ এইরূপ — "তিনি ছিলেন, তাঁহার নাম ট্যায়ারোআ; তিনি অনন্তে ছিলেন, পৃথিবী ছিল না, স্বর্গ ছিল না, মানুষ ছিল না।" আর একটি গান বলিতেছে — "মহানিয়ামক ট্যায়ারোআ পৃথিবীর স্রষ্টা, — তাঁহার পিতা নাই, বংশ নাই।" আ্যান্দামানদিগের ও ফিংগোয়ে রেডস্কিনদিগের ধর্ম্মমতও উচ্চাঙ্গের। (আ, দ্য কাৎরফাজ প্রণীত "মনুষ্যজাতি" [Human Species] ১৮৮১ সাল, লণ্ডন — ৪৮৩ পৃঃ)। আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ প্রোটো-এরিয়ানগণ বর্ত্তমান অসভ্যজাতিগণের মত অবস্থাতেই দ্যৌঃ পিতৃ অর্থাৎ আকাশপিতাকে (জুস, জুপিটার) প্রধান দেবতা বলিয়া উপাসনা করিত। আর্য্যজাতির প্রাচীনতম কীর্ত্তি ঋগ্বেদে দ্যৌঃকে সকল দেবের আদি বলা হইয়াছে।

৫ বিশেষজ্ঞ মনুষ্যতত্ত্ববেত্তারা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন যে অসভ্যজাতিরা নৈতিক জ্ঞান বিবর্জিত নহে। অতি হীন অসভ্যজাতিদের ভিতরেও সম্পত্তি জ্ঞান, মনুষ্য জীবনের প্রতি সমাদর, এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে, ইহা এখন স্বীকৃত। এমন কোনও অসভ্য জাতির বিষয় জানা যায় নাই যাহারা চৌর্য্য ও হত্যাকে অন্যায় ভাবে না, ও যাহাদের অপরিচিতের প্রতি ভাব নাই। কতিপয় উন্নত জাতির ভাষা হইতে জানা যায় যে অসভ্য অবস্থাতেই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাথমিক জ্ঞান, ন্যায় পরায়ণতা ও সরলতার ধারণা ছিল। চীন ভাষায় ইহার উদাহরণ মিলিবে। এক যথা,

সাধুতা বোধক শব্দটী 'আমার' ও 'মেষ' এই দুইটি কথার সংযোগে সৃষ্ট, স্বত্ব বোধক চো শব্দ 'নিজের' ও 'মেষ' এই দুই ভাগে বিভক্ত, এবং পরীক্ষা দ্বারা সুবিচার বোধক Tseang (ৎসীয়াং) শব্দ ইয়েন (Yen) ও ইয়াং (Yong) = মেষের কথা বলা এই দুই শব্দ যোজনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল কথা হইতে জানা যাইতেছে যে চীনগণ যখন নিতান্ত হীন গ্রাম্য অবস্থায় ছিল তখনও তাহাদের সম্পত্তির, ন্যায়-পরায়ণতার ও সরলতার জ্ঞান ছিল।

এইরূপে মনুষ্যের তিনটি অবস্থা হয় ঃ-

প্রথম — পাশবিক অবস্থা — এই অবস্থায় শরীর ও চিত্তবৃত্তি বিষয়ে পশু হইতে মানুষের পার্থক্য বুঝা যায় না।

দ্বিতীয় — মধ্যাবস্থা — এই অবস্থায় মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তির আত্যন্তিক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া তাহাকে পশুজাতি হইতে পৃথক করিয়া দেয়।

তৃতীয় — বিশিষ্ট মানবাবস্থা — এই অবস্থায় মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি তাহাকে পশুজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় এবং এই বিচ্ছেদ এত সম্পূর্ণ যে কোনও কোনও প্রাণীতত্ত্ববিদগণের অভিমত যে তদ্বারা মানবজাতি মনুষ্যসৃষ্টি বলিয়া এক বিশেষ সৃষ্টির দাবী করিতে পারে।

এখন পর্য্যন্ত পশুর ও মনুষ্যের মাঝামাঝি কোনও জীবের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মস্তিষ্কাধারও মনুষ্যের ও পশুর মাঝামাঝি এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ঃ- অন্ততঃ ডারউইন তাঁহার "মনুষ্যের আবির্ভাব" (Descent of Man – ৪র্থ পরিচ্ছেদ) নামক গ্রন্থে কতকগুলি পশুতে ঐ দুই শক্তির অঙ্কুরাবস্থায় থাকা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তদপেক্ষা এ কথা অনেক পরিমাণে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

মানব ভ্রূণের পরিণতির ক্রমের মধ্যে যেমন হীন হইতে শ্রেষ্ঠ মেরুদণ্ডী জীবদেহ পরম্পরায় মনষ্যের ক্রমাভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনিই তাহার জীবনের বিকাশ পদ্ধতিও বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে তাহার উন্নতির ক্রমের উদাহরণস্বরূপ। বাল্য ও পৌগণ্ডে তাহার পাশব প্রবৃত্তি সকল প্রবল থাকে; এই সময়ে চিন্তার পাণ্ডুর ছায়াপাতে তাহার মন অসুস্থ হয় না। প্রৌঢ়ত্বে বুদ্ধিশক্তির ও বার্দ্ধক্যে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়।

সকল অসভ্যজাতিকেই সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করিতে হইলে ঐ সকল অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেই হইবে। একজন তেজস্বী ও সুখান্বেষী যুবকের কাছে বৃদ্ধোচিত বিজ্ঞতা ও পারত্রিকতা আশা করা যেমন অসঙ্গত, কোনও নবোত্থিত ও তেজোদৃপ্ত সভ্যজাতির নিকট প্রাচীন ও পরিপক্ক সভ্যতাসুলভ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের আশা করাও সেইরূপ অসঙ্গত।

সভ্যতার প্রথম স্তরে মনুষ্য সমাজ তাহার পাশবিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত থাকে; এইজন্য লুণ্ঠনবৃত্তি তখন স্বাভাবিক। এ অবস্থায় আত্মা জড়ের অধীন, এবং তখনকার সভ্যতাও জড়ানুগত। যে সকল শিল্পের দ্বারা জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা, সুবিধা ও বিলাস বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শিল্পই এই সময়ে আবিষ্কৃত ও পুষ্ট হয়। এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি এবং জীবনের পাশব প্রয়োজনের চরিতার্থতা কিংবা চিত্তবৃত্তির আলোচনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায় কবিতা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পের বিকাশ হয়, এবং এই কারণে সভ্যতার প্রথম স্তরকে কলাশিল্পের স্তর বলা যাইতে পারে। এ স্তরের সর্ব্বকালেই শিল্পকলাগুলি বস্তুতন্ম (Realistic) হইয়া থাকে; তাহার অতিরিক্ত কিছু আশা করাও যাইত না। এ সময়ে দর্শনশাস্ত্র একেবারে নাই, জ্যোতির্বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics) ভিন্ন অন্য কোনও বিজ্ঞান উন্নত হয় নাই। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মনুষ্যজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বিশ্বাস হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং কলা ও শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য যন্ত্রশাস্ত্র (Mechanics) অনুশীলিত হইত। ধর্ম্ম অনেক পরিমাণ বস্তুগত, এবং প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের ও রণনৈপুণ্যের জন্য প্রখ্যাত শূরবৃন্দের উপাসনায় পর্যবসিত ছিল। ধর্ম্মভাবের প্রসার ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মিক উন্নতি বড় বেশী হয় নাই। ইন্দ্রজাল, মোহিনীবিদ্যা ও ডাকিনীবিদ্যার বিশ্বাস প্রবলভাবে বিস্তৃত ছিল। যে সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, এবং পাশব-বল যেখানে উচ্চতম সমাদর লাভ করিত, ও জনসাধারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন অন্য সুখের সন্ধান জানিত না, সে সমাজে নৈতিক বুদ্ধির বিশেষ পুষ্টির আশা করা যায় না।

সভ্যতার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্ত্তী স্তরকে বুদ্ধিবৃত্তির বা মানসিক উন্নতির স্তর বলা যাইতে পারে। তখন আর আত্মার উপর জড়ের প্রভুত্ব থাকে না, যুক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নিয়মের সাম্রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হয়। তখন মানবজাতি কেবল তাহার পাশবজীবনের জন্যই ব্যস্ত থাকে না, তাহার জীবনানুভূতি প্রশস্ত হয়; সে প্রাকৃতিক ও আত্মিক ঘটনাবলীর কারণ ও নিয়ম অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতে প্রযত্ন করে। এইরূপে বিজ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়। প্রথম স্তরে শিল্পকলার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা থাকিয়া তো যায়ই, বরং অনেক সময় তাহার পুষ্টিও হইতে পারে। কিন্তু ধীশক্তি শিল্প বিষয়েই নিমগ্ন না থাকিয়া এমন সকল বিষয়ের চর্চ্চায় নিযুক্ত হয় যাহাদের সহিত লাভের বা মনুষ্যের পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। কলাবিদ্যা অনুকরণ ও বাস্তবপ্রিয়তা ছাড়াইয়া সেই বিশুদ্ধ (Classic) অবস্থায় ওঠে, যে অবস্থায় জড় ও আত্মার মিলনের মধ্যেই সৌন্দর্য্য অন্বেষিত হয়। কবিত্ব তখন অর্দ্ধসভ্য শূর ও দেবগণের রণকৃতিত্ব ও প্রণয়-সাহসিকতার বর্ণনা ছাড়িয়া তখনকার মার্জ্জিতবুদ্ধির ও নৈতিকজ্ঞানের উপযোগী নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য প্রণয়নে ব্রতী হয়। সমরপ্রিয়তা ও লুণ্ঠনাসক্তি প্রশমিত হইতে আরম্ভ করে। এ স্তর যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই

জনসাধারণ পশুবলের অপেক্ষা বিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমাদর করিতে শেখে; পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের অপেক্ষা মনুষ্যত্ব ও আত্মসংযম বাড়িয়া যায়। প্রথম স্তরে ভগবৎ সম্বন্ধে যে মনুষ্য কেন্দ্রীভূত ধারণা ছিল, তাহার সহিত এ স্তরের যুক্তিমূল প্রকৃতির সঙ্গতি হয় না। শিক্ষিত শ্রেণী হয় নাস্তিকতার নয় অজ্ঞানতাবাদের (Agnosticism) কিম্বা কোন না কোন আকারের একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর প্রভাব অজ্ঞ ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া তাহাদেরও মতের পরিবর্ত্তন সম্পাদন করে, এবং তাহাদের জীবনে ইন্দ্রজাল মোহিনীবিদ্যা বা ডাকিনীবিদ্যার প্রভাব একেবারে তিরোহিত না হইলেও, এত কমিয়া যায় যে না থাকারই মধ্যে দাঁড়ায়।

তৃতীয় স্তরে পাশব জীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি, বাহ্যজীবন অপেক্ষা আভ্যন্তরিক জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে লোকসকল বহির্জগতের পরিবর্ত্তে অন্তর্জগতে, এবং আত্মতৃপ্তি ছাড়িয়া আত্মসংযমে সুখের সন্ধান করে। যে সব শিল্পকলা শরীরের সুখ ও বিলাস বিধান করে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সে-সকলের প্রতি বড় একটা মনঃসংযোগ করেন না। উন্নত শ্রেণীর কাছে ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার হইয়া পড়ে, এবং অশিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেও কতকটা এইরূপই হয়। উন্নত শ্রেণীর লোকেরা স্বার্থ দমন ও পরার্থপরতাকে জীবনের নিয়মস্বরূপ করিয়া লন। স্বার্থত্যাগ ও দয়া অভূতপূর্ব্ব প্রসার লাভ করে। যে সমরপ্রিয়তা দ্বিতীয় স্তর হইতেই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা এখন অধ্যাত্ম পথে উন্নত ব্যক্তিদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। পার্থিব, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধায়িনী শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা লক্ষিত হয়, এবং সমাজে চাঞ্চল্য অপেক্ষা ঐক্যের লক্ষণ অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠে। আমরা যে তিনটি স্তরের কথা বলিলাম ইহাদের সমষ্টিকে মানবের উন্নতির এক একটি যুগ বলা যায়। এই উন্নতির ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা সুবিধাজনক। প্রথমযুগের অস্তিত্ব খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ সহস্র শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই মিশর, ব্যাবিলন ও চীনের প্রাথমিক সভ্যতার ইতিবৃত্তও পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর হইতে সাত শত খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে মিশর ও চীনের পরবর্ত্তী সভ্যতা এবং ভারতবর্ষ, (এই স্থানে মিঃ বসুর সহিত আমাদের মতদ্বৈধ আছে, ভারতীয় সভ্যতাকে এত পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবার কোনও হেতু মিঃ বসু নির্দ্দেশ করেন নাই। — জি লা র), গ্রীস, রোম, এসিরিয়া, ফিনিসিয় ও পারস্যদেশের সভ্যতার উত্থান হয়। আমরা এখন তৃতীয় যুগে। এই যুগ ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় (যাহাকে পাশ্চাত্য বলা যায়) সভ্যতার উত্থান ও উন্নতি এই যুগের মুখ্যতম ঘটনা। প্রত্যেক যুগই কোনও না কোন জাতীয় বা রাজনৈতিক ঘটনা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অনধিকারপ্রবেশী বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক মিশর, কালডীয়া ও চীনের আদিম নিবাসিগণের

পরাজয় হইতে প্রথম যুগের সূত্রপাত। এই যুগ প্রধানতঃ সিমীয আধিপত্যের কাল। সিমীয অথবা মিশ্রিত সিমীয়, চীন ভিন্ন তখনকার সমগ্র সভ্য জাতিক উপর আপন প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। দ্বিতীযযুগের প্রথম ক'এক শতাব্দীতে এক চীন ভিন্ন অপর সকল সভ্য জাতির মধ্যে ভাব বিনিময়ার্থ ব্যাবিলোনীয় ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই সময়ে আর্য্য জাতির আবির্ভাব; এই জাতি দ্বারা সভ্যতার যে পরিমাণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল তেমন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

আর্য্যজাতির আদিম নিবাস সম্বন্ধে এখনও ভাষা-তত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। প্রায় দুই সহস্র তিন শত খ্রীঃ পূঃ অব্দে ব্যাবিলোনীয়ার খামুরাবির সময়ে, আর্য্যজাতির এক অংশ ব্যাকট্রিয়া ও পূর্ব্ব ইরানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কতকগুলি হেতু আছে। ইহারই আর এক অংশ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসরে ভারতে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অসভ্য আদিম নিবাসিগণকে জয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। (ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ভারত প্রবেশকাল সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ মত। অধ্যাপক জ্যাকবি ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই ঘটনা'কে খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দ অথবা তদপেক্ষা আরও প্রাচীনকালে লইয়া যাইবার পক্ষপাতী)। মিটানি নামক আর্য্যজাতির আর এক শাখা প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে এসিয়া মাইনরে প্রাধান্যলাভ করে। (এসিয়া মাইনরের বোঘাজকিয়ৈ (Boghazkioi) নামক স্থানে খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দের এক উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় যে বৈদিক দেবতা মিত্রাবরুণ ইন্দ্র ও নাসত্য উদ্বোধিত হইয়াছেন। (রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা অক্টোবর ১৯০৯, ৮৪৬ পৃঃ ও জুলাই ১৯১০, ১০৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আর্য্যজাতির হেলেনীস্ নামক তৃতীয় শাখা গ্রীসে অভিযান পূর্ব্বক পেলাস্‌গীয়গণকে পরাভূত করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে, এবং ইহাদের চতুর্থ অথবা রোমক শাখা অপেক্ষাকৃত সভ্য ইট্রসকানদিগকে পরাজিত করে। আনুমান ২০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে হীক্‌সো নামক এক অসভ্য জাতি মিসর আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজবংশ ধ্বংস করিয়া সেখানে আপনাদের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। খামুরাবি ও তাঁহার বংশধরগণের সময় যাহার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ অব্দে ইলাম পর্ব্বত হইতে সমাগত ক্যাসাইটস্ নামক এক অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হয়। ক্রমশঃ এই সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং ইহার ধ্বংসাবশেষ হইতে এসিরিয় নামক এক নূতন সাম্রাজ্য উত্থিত হয়। একমাত্র চীনদেশে অতি সামান্য উপদ্রবের সহিত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল; এখানে ন্যূনাধিক ১৭৬৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সেই দেশেরই শাসকবংশ ইয়ায়ু কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজবংশকে উচ্ছিন্ন করিয়া তৎস্থলাভিষিক্ত হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মান্য (German) জাতিপুঞ্জ দ্বারা রোম সাম্রাজ্য জয়; সপ্তম ও অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে আরব্য জাতির আক্রমণ; সীরিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষে প্রবেশ, আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে টলটেকগণ (Toltec) কর্ত্তৃক মেক্সিকো

বিজয় এবং নবম ও দশম শতাব্দীতে পেরুতে ইনকাগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা (আমেরিকার টল্‌টেক পূর্ব্ব এবং ইন্‌কা পূর্ব্ব সভ্যতার ইতিবৃত্ত এখন পর্য্যন্ত যা পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই দুই সভ্যতা বোধ হয় দ্বিতীয় যুগের। ইন্‌কা ও টল্‌টেকগণ ও তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ, টেক্‌স্‌কিউকাসগণ ও আজটেকগণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম স্তরের সমসাময়িক; তাহাদের সভ্যতার প্রথম স্তরে বেশ উন্নতি সাধন করিয়াছিল) প্রভৃতি ঘটনাবলী হইতে মানব - সভ্যতার তৃতীয় যুগের সূচনা।

সমাজতত্ত্বের জটিল রহস্যাবলীর উদ্ভেদ করা সর্ব্বদাই অতি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যা আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কঠিনতর. কারণ ঐ দুই যুগ পূর্ব্ববর্তী এক কিম্বা একাধিক যুগের ফলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরম্ভ হয়। তৃতীয় যুগে ইহা গূঢ়তম। যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সভ্যতা হয় নষ্ট, নয় স্থিতিশীল হয়, তথাপি তত্তৎ যুগের ফলগুলি অনেকাংশে রক্ষিত থাকে। যদিও বৃক্ষগুলি মৃত কিম্বা ফল প্রসবে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহা হইলেও তাহাদের অনেকগুলি সবীজ ফল রহিয়া গিয়াছিল এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে আবার অঙ্কুরোৎপাদনক্ষমও ছিল। এই সকল কারণে, অর্থাৎ বাহিরের ও ভিতরের নিম্নস্তরের ও শ্রেষ্ঠস্তরের সভ্যতার মেশামেশি হওয়ায়, এই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা করা বা ভেদ-নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরব্যগণ যখন রণোন্মুখ ও জড়ের ভক্ত ছিল সেই সময়ে তাহাদিগকে জোর করিয়া জনৈক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এবং অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাপুরুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত এমন এক ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল, যে ধর্ম্ম অন্য এক বিদেশী ধর্ম্মের প্রভাবে উৎপন্ন, যাহা আবার হয়তো মানবোন্নতির দ্বিতীয়যুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ফলস্বরূপ বহু দূর দেশের অপর এক ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুন্নত একটি সমাজের সহিত এক মহোন্নত ধর্ম্মের অযোগ্য সংযোগ ঘটিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার ফলনিচয়ের সংসর্গে পড়িয়া আরবগণ অচিরে সেই সকল সভ্যতার প্রকৃতি কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় আসক্ত হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নিগ্রোদিগেরও এইরূপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না, যে, সমগ্র আরব সমাজ বা নিগ্রো সমাজ মানসিক উন্নতি সাধিত করিয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যেই অনেকগুলি ধর্ম্মান্ধ অজ্ঞ এবং ধর্ম্মোন্মত্ত সারাসেন সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের ভক্ত হইল। তাহারা দর্শন গণিত ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেকগুলি সংস্কৃত ও গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ফেলিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে বোগদাদের আব্বাসাইড বংশ, মিশর ও স্পেনের ওম্মেদি বংশ বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিল; এবং বোগদাদ, কায়রো ও আন্দালিউসিয়া তখনকার সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজ তখনও সভ্যতার প্রথম স্তরে অবস্থান

করিতেছিল। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তাহারা দ্বিতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মানসিক উন্নতি কলাবিদ্যায় পর্য্যবসিত ছিল, এবং কবিত্ব ও ভাস্কর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও বিষয়ে তাহারা অতি সামান্যই মৌলিক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানে তাহারা মুখ্যভাবে বাহক মাত্রের কার্য্য করিয়াছে, অর্থাৎ ভারতীয় ও যাবনিক (গ্রীসদেশের) সভ্যতার কতকগুলি মূল্যবান ফল সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের কাছে বহন করিয়া আনিয়াছে মাত্র।

সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থান কালেই মঙ্গোলীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহারা ঐ ধর্ম্ম, সভ্যতার যে স্তরের একটি মহত্তম ফল সেই স্তরে উঠিয়াছিল তাহা নহে। ইউরোপের অসভ্যগণ দ্বিতীয়যুগের প্রাচ্য সভ্যতার শেষ অবস্থার একটি উৎকৃষ্টতম ফল খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে ইহাকে তাহারা পরিপাক করিতে পারে নাই। এ ধর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে নাই, এবং তাহারা নামে মাত্র ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি বহুদিনযাবৎ তাহারা সভ্যতার প্রথম স্তরেই থাকিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্ম অবলম্বন কালে তাহারা যতটুকু উন্নতি করিয়াছিল, তাহার সহিত ইহার পরার্থপরতার কোনও সামঞ্জস্য ঘটে নাই। নির্ম্মম ও অন্তহীন অগ্নিদগুরূপ সিদ্ধান্ত, অনন্ত নরক যন্ত্রণার বীভৎস দৃশ্যের কল্পনায় টারটিউলিয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মমীমাংসকগণের পৈশাচিক উল্লাস, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মমণ্ডলী (Church) কর্ত্তৃক ইহুদীগণের উপর রীতিমত ও সংকল্পিত নিষ্ঠুরতার সহিত অত্যাচার, সেই সকল জাতিরই উপযুক্ত যাহাদের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর লোকেরাও ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে বৃষ ও ভল্লুক বধ করিয়া অশেষ আমোদ অনুভব করিত।

সভ্যতার যুগ-নিচয়ের সহিত ভূতত্ত্বের (Geology) যুগগুলির সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারাও অত্যাবশ্যক ভৌগোলিক ও জৈবিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা সূচিত হয়। মানবোন্নতির পর্য্যায়ের সহিত পৃথিবীস্থ নানা দেশের উদ্ভিজ্জ ও পশুসঙেঘর উন্নতির পর্য্যায় তুলনা করিয়া দেখিলে এই সাম্য ঘনিষ্ঠতর মনে হয়। এক প্রকৃতির পশুসঙ্কুল ভূপঞ্জর পৃথিবীর এক অংশে যে ভাবে গঠিত, অপর অংশেও সেই ভাবেই গঠিত দেখা যায়। তেমনই যে সকল ভূস্তরের (Deposits) নিম্নে আদিম প্রস্তর যুগের মানবাবশেষ প্রথিত দেখা যায়। তাহারা — কিম্বা পরবর্ত্তী কালের শৈল্প, মানসিক বা নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক স্মৃতিস্তম্ভ ও লেখাদি, যেখানে যেখানে একই স্তরে পাওয়া যায় তাহারা যে একই কালের তাহা সিদ্ধান্ত করিলে ভুল করা হয় না — অবশ্য যদি তাহারা অন্যত্র হইতে আনীত না হইয়া থাকে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে যে সাবধানতার প্রয়োজন — যাহার বিষয় পরে বলা যাইবে — তাহা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং মেগালিথিক (প্রকাণ্ড অখণ্ড প্রস্তরের) স্মৃতিস্তম্ভ (ডলমেন, ক্রমলেক প্রভৃতি) যাহাদের গঠনপ্রণালী অক্ষত অথবা অল্পক্ষত বৃহৎ প্রস্তরসমূহকে সমতল ছাদবিশিষ্ট কুটীরের আকারে সজ্জিত করা ভিন্ন আর কিছু নহে — গ্রেট ব্রিটন, জার্ম্মানি,

ফ্রান্স, স্পেন, সীরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, অথবা ভারতবর্ষ যেখানেই পাওয়া যাক, তাহারা যে নব-প্রস্তর-যুগে নির্ম্মিত তাহা বলা যাইতে পারে।

প্রথমযুগের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সহিত, মিশরের ও চীনের সভ্যতার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে মিল দেখা যায়। ব্যাবিলন মিশরের নিকটবর্ত্তী, এই জন্য একদেশের চিন্তাফল ও রীতিনীতি অন্যদেশে আনীত হইয়াছে, ঐ দুই দেশ সম্বন্ধে ঐ সাদৃশ্যের এই প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু চীন ও ব্যাবিলোনীয়ার মধ্যে ব্যবধান এত বিস্তর, ও বাহ্য অন্তরায় সমূহ এত দুর্লঙ্ঘ্য, যে, সেই সুদূরযুগে তাহাদিগকে অতিক্রম করা একরূপ অসম্ভব ছিল, এবং ইহাদের সভ্যতার সাদৃশ্য (ইতিহাসের প্রারম্ভেই চীন ও কাল্‌ডীয়ার জ্যোতিষিক জ্ঞানের সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি কোন পরিমাণ বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণাগুলিতেও এই সারূপ্য দেখা যায়। অধ্যাপক আর কে ডগলাস বলিয়াছেন ঃ "সুকিং অর্থাৎ চীনের ইতিহাস পুস্তকের একটি আদ্য পরিচ্ছেদে এমন কতকগুলি জ্যোতিষিক লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে যদ্দারা বুঝা যায় যে দিক্ চতুষ্টয়কে পশ্চিমাভিমুখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ দিক্‌দর্শনাস্ত্রের সংস্থানের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উত্তর দিক্‌কে বায়ুকোণ এবং দক্ষিণদিক্‌কে অগ্নিকোণ স্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্যন্ত এই দিক্‌পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ কেবল খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৬ অব্দে অবস্থিত বুদ্ধিমান, ও সুশিক্ষিত সম্রাট ইয়াউর জ্যোতিষিক জ্ঞানের নিন্দাবাদে পর্য্যবসিত ছিল। কিন্তু ডাক্তার দ্য লাকুপেরি দেখাইয়াছেন যে ফলালিপিময় ফলকগুলি (Cuneiform Tablet) হইতে জানা গিয়াছে, যে আকাডিয়ানগণের মধ্যেও এই দিক্ পরিবর্ত্তন প্রথা প্রচলিত ছিল। এই আবিষ্কারের সমর্থক প্রমাণস্বরূপ উক্ত পণ্ডিত আরও দেখাইয়াছেন যে কালডীয়ার বেলমেরোডাকের মন্দির ভিন্ন অন্য সকল মন্দিরই ঐ প্রকার পশ্চিমাভিমুখ করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে।" — কনফিউসিয়ানিজ্‌ম্ (৯-১০ পৃঃ) সম্বন্ধে উপরিকথিত হেতু নির্দ্দেশ করা আদৌ সমীচীন নহে।

দ্বিতীয়যুগের দ্বিতীয়স্তরের গ্রীক চিন্তাপ্রণালী অনেক বিষয়ে সেই সময়কার ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সদৃশ এবং এই দুই দেশের মধ্যে সংসর্গ এত বেশী ছিল না যাহা দ্বারা এই সাম্য বুঝা যায়। দ্বিতীয় যুগের তৃতীয় স্তরের চীনের ও ভারতবর্ষের সভ্যতার অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। এমনকি চীনের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক লাউৎসে যে আধ্যাত্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বেদান্তের সহিত এত মিলে যে অনেকে মনে করেন যে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার ডগলাস বলিয়াছেন "আমরা লাউৎসের ইতিহাস এত কম জানি যে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা বলা অসম্ভব। হয়তো তাহা হইয়াছিল; কিন্তু উহা হউক বা না হউক তৎপ্রচারিত তাও ধর্ম্ম ও হিন্দু যোগশাস্ত্র-এই দুইটির মধ্যে সাদৃশ্য আশ্চর্য্যজনক। যখন আমরা শুনিতে পাই যে হিন্দু যোগশাস্ত্র

স্বার্থপর ধর্ম্মের উপর নিঃস্বার্থ প্রেমের আসন দেয়, এবং বৈদিক ক্রিয়ার এবং নিয়ম প্রতিপাদক সাহিত্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, এবং তাহার অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদনোপলক্ষে কর্ত্তা ও কর্ম্মের, ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের একীকরণ সাধন করে, এবং ইহার চরম লক্ষ্য পরমাত্মায় লীন হওয়া, ও ঐ অবস্থার উপায়স্বরূপ ঐ শাস্ত্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ত্ব আত্মচিন্তা ও সর্ব্বশক্তির বিলোপ উপদেশ করে; এবং এই শাস্ত্রমতে সময়ে অসীমের উপলব্ধি হইতে পারে, এবং অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায়, তখন লাউৎসের মনে প্রথম উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়া তাও ধর্ম্ম যে যে অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী কুসংস্কারময় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, সব যেন দর্পণে প্রতিফলিতের ন্যায় দেখিতে পাই।" — কনফিউসিয়ানিজম্ ও টাওইজম। ২১৮ - ১৯।

লাউৎসের জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে। অতএব তিনি বুদ্ধ অপেক্ষাও প্রাচীন। এবং যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে ভারতে ও চীনে সেই সময় সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে একের দ্বারা অপরের অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব ছিল। (তথাপি এক্ষেত্রে বুদ্ধ কর্ত্তৃক লাউৎসের অনুপ্রাণিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব)।

তিনি ভারতবর্ষের নৈতিক উন্নতির আদর্শে উঠিয়া "উপকার করিয়া অপকারের প্রতিদান কর" এই মহোচ্চ শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "আমার তিনটি অমূল্য রত্ন আছে, তাহাদের আমি সর্ব্বদাই কাছে রাখি ও আদর করি — তাহারা দয়া, মিতাচার ও বিনয়। আপনাকে জানিয়াই তৃপ্ত হও, তোমার সমকক্ষ মানবকে বিচার করিতে বসিও না। যে যথার্থ ভাল লোক সে সকলকেই ভালবাসে, কাহাকেও ত্যাগ করে না।"

সভ্যতার ও ভূতত্ত্বের যুগনিচয়ের তুলনায় আলোচনা এবং বিভিন্ন অবস্থার সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্দেশ একটু সাবধান হইয়া করিতে হয়। এক সময়ের সভ্যতা পরবর্ত্তী সময়ে গৃহীত হইতে পারে, যেমন দ্বিতীয় যুগের যবনিক ও হিন্দু সভ্যতা তৃতীয় যুগের সারাসেনগণ লইয়াছিল। আবার এমনও হইতে পারে যে এক দেশের কোনও যুগের সভ্যতা পরবর্ত্তী যুগ পর্যন্ত থাকিয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থলে যে ভূ-স্তরের নীচে আদিম প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহারা যে ঐ যুগের নহে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; বস্তুতঃ কোনও দেশে এক উচ্চাবস্থার সভ্যতা যে অপর এক নিম্নস্তরের সভ্যতার স্থলাধিকার করিয়াছে অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

যেমন পৃথিবীর এক অংশের ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোনও যুগের উদ্ভিজ্জ ও পশুসঙ্ঘ পৃথিবীর অন্য অংশের সেই যুগের উদ্ভিজ্জ ও পশুসঙ্ঘের ঠিক সমসাময়িক হয় না, সেইরূপ কোনও যুগের কোন স্তরে এক দেশে সভ্যতার যে সকল ফলাফল প্রসূত হইয়াছে তাহারা অপর দেশে সেই যুগের সেই স্তরের প্রসূত ফলাফলের ঠিক সমসাময়িক নাও হইতে পারে। যথা — দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয় অর্থাৎ মানসোন্নতির পর্য্যায় গ্রীসে খ্রীঃ

পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে যাবনিক (Ionic) মতের প্রতিষ্ঠাতা মিলেটস্‌বাসী থেলিস্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে এই পর্য্যায় দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা বলিবার কতকগুলি হেতু আছে। ঐ যুগের তৃতীয় বা নৈতিক পর্য্যায় ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের, চীনে লাউৎসের ও কন্‌ফিউসিয়সের, পারস্যে দেরায়ুসের রাজত্বকালে জোরোয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মপ্রচারের এবং প্যালেস্টাইনে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত ইহুদী ধর্ম্মপ্রচারের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীসে ইহার আরম্ভ সক্রেটিসের সময়ে, অর্থাৎ একশত বৎসর পরে। এই নৈতিক বিপ্লবের প্রাবল্য ও স্থায়িত্ব নানা দেশে নানাবিধ। ভারতবর্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বিশিষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

অন্যান্য জৈবিক সংস্থানের মত সভ্য মানবেরও স্থিতিবিধানের নিয়ম এই যে, জীব যত উন্নত তাহার বাসস্থান সেই পরিমাণে সংকীর্ণ। আদিম প্রস্তর যুগের মানব পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া ছিল। কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালনের জ্ঞান সম্পন্ন এবং উন্নততর যন্ত্রাদি সমন্বিত নব - প্রস্তর যুগের মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ব্যাধ ও ধীবরবৃত্তি আদিম প্রস্তর যুগের মনুষ্য অপেক্ষা অনেক উন্নত। নব প্রস্তর যুগের মানবের বাসভূমি ইহাদের আদিম প্রস্তরযুগবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের বাসভূমি অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ। মানব যখন সভ্য হইল তখন আবার তাহার বাসস্থান আরও অল্প পরিসরে নিবদ্ধ হইল। পুরাকালের সভ্যতা উত্তর ভূগোলার্দ্ধের অক্ষরেখার কতিপয় অক্ষাংশের মধ্যে, আর্য্য, সিমীয় ও মঙ্গোলীয়মাত্র এই তিন জাতির ভিতরে আবদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যেও আবার কোনও কোনও জাতি সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উপরে উঠিতে পারে নাই। উদাহরণ — আসীরিয়গণ; ইহারা দ্বিতীয় যুগে বিলক্ষণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহারা যেমন হস্তপ্রসূত শিল্পে, তেমনই কৃষিকার্য্যে দক্ষ হইয়াছিল। তাহারা নিম্নকথিত শিল্প সমূহের যথেষ্ট উৎকৃষ্ট সাধন করিয়াছিল — বর্ণ-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বস্ত্র, সুসম্পন্ন আস্তরণ (Carpet), বিস্তর সূচিশিল্পসমন্বিত পরিচ্ছদ, মূল্যবান ও সুন্দরভাবে অলংকৃত গৃহসজ্জা, হস্তিদন্তে স্বর্ণখচিত ও খোদিত কারুকার্য্য, কাচের ও বহুবিধ এনামেলের দ্রব্য, ধাতুময় দ্রব্য, অশ্বসজ্জা এবং রথ। প্রয়োজনীয় শিল্পের অধিকাংশই বেশ অনুশীলিত হইয়াছিল, এবং পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা ও অলঙ্কারাদির সম্বন্ধে তাহারা এখনকার লোকের অপেক্ষা বেশী পশ্চাৎবর্ত্তী ছিল না। কিন্তু এতটা পার্থিব উন্নতি সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে মানসিক বা নৈতিক উন্নতির লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না। আসীরিয়ার রাজারা তাঁহাদের উৎকীর্ণ লিপিতে বারবার নিজেদের নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়াছেন, যেন ইহা একটা গৌরবের বিষয়। একজন বলিয়াছেন-"আমি ২৬০ জন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুণ্ডগুলির স্তূপ (Pyramid) নির্ম্মাণ করিলাম।" আর একজন বলিয়াছেন "আমি প্রতি দুইজনের মধ্যে একজনের প্রাণবধ করিলাম; নগরের বৃহৎ তোরণের সম্মুখে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া আমি বিদ্রোহীদলের অধিনায়কগণের ছাল ছাড়াইয়া তদ্দারা এই প্রাচীর আচ্ছাদিত করিলাম। কতকগুলাকে

জীবদ্দশায় গাঁথিয়া দিলাম, কতকগুলাকে এই প্রাচীরে ক্রসবিদ্ধ অথবা শূলবিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম। আসীরিয়ার ইতিহাস তত্রত্য নৃপতিবৃন্দের অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত সম্পাদিত পরস্বাপহরণ ব্যাপারের বৈচিত্র্যহীন বিবরণে পূর্ণ।

সমাজতত্ত্বের উপকরণ এত জটিল, এবং ঐ উপকরণ যে সকল লেখাদিতে পাওয়া যায় তাহাও এত অসম্পূর্ণ, এবং ঐ লেখাদির অভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা এত দুরূহ, যে, কোন সামাজিক সমষ্টি কোন সময়ে সভ্যতার এক স্তর হইতে অন্য উচ্চতর স্তরে উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কঠিন। যে সমাজ অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে অথবা সভ্যতার প্রথম স্তরে সবে উঠিয়াছে, তাহাতেও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কিম্বা মানসিক ও নৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অভ্যুদয় হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু এমন ব্যক্তির নিজ সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় সমাজে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। আদিম প্রস্তর যুগেও এমন ধীশক্তিশালী শিল্পী জন্মিয়াছিল যাহাদের শিল্পকার্য্য এখনকার সেই শ্রেণীর শিল্পকার্য্যের সহিত তুলনাতেও কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু এইরূপ ঘটনা এত বিরল যে, তাহারা যে সমাজে বাস করিত সেই সমাজ যে কলাশিল্পসূচিত সভ্যতার প্রথম স্তরে উন্নীত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ঋগ্বেদের সময়ের ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যখন সভ্যতার প্রথম স্তরে ছিলেন তখনি তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহারা পরবর্ত্তী স্তরগুলির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন। তাই বলিয়া বলা চলে না যে সেই সময়কার সমগ্র আর্য্যসমাজ তত্তৎ স্তরে উন্নত হইয়াছিল।

এতো গেল অপেক্ষাকৃত সহজ উদাহরণ। সমাজতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর সমক্ষে ইহা অপেক্ষা অনেক জটিলতর সমস্যা উপস্থিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক এবং গ্রীসে সক্রেটিস কর্ত্তৃক সভ্যতার তৃতীয় অথবা নৈতিক স্তর সূচীত হইয়াছিল। কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ কারণে ঐ কথায় আপত্তি হইতে পারে। একদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পূর্ব্বেই পাইথাগোরাস এবং উপনিষৎ রচয়িতৃগণ আর্বিভূত হইয়াছিলেন; এবং অপরদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ এবং সক্রেটিস্ যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে ফল প্রসব করিয়াছিল। প্রথমোক্ত তর্ক প্রণালীর দ্বারা আমরা তৃতীয় স্তরের সূত্রপাতের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা পিছাইয়া যায় এবং দ্বিতীয় তর্ক প্রণালী দ্বারা উহা আগাইয়া আসে। পাশ্চাত্যজগতে অনেক লোক আছেন যাহারা নৈতিক স্তরে পঁহুছিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সমাজ নৈতিক স্তরে পঁহুছিয়াছে কিনা তাহা প্রশ্নের বিষয়। এমন একটি সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা যায় যে, যাঁহারা নৈতিক স্তরে উপনীত হইয়াছেন তাঁহারা যাবৎ সমগ্র সমাজের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন যদ্দারা সমাজসমষ্টির জীবনে ও কার্য্যে তাঁহাদের শিক্ষা অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ কোন সমাজকে নৈতিক বা তৃতীয় স্তরে উন্নত বলা চলে না। কোন

সমাজ সভ্যতার এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে কিনা এই তথ্যের বিচার আমবা উক্ত সূত্রাবলম্বনেই করিয়াছি। কিন্তু যে সমাজ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ কবিয়াছে, সেই সমাজেই প্রথম স্তরের জনসংখ্যাই বেশী, ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহাবা অসভ্যদশার একটু উপরে উঠিয়াছে মাত্র, এবং তত্রত্য উন্নত ব্যক্তিরা সমাজকে যে পথে চালাইতে চাহেন, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত পথে উহাকে লইয়া যাইতে চায়। সভ্য সমাজে সর্ব্বদাই এইরূপ বিরোধী শক্তিপুঞ্জের ক্রিয়া চলিতেছে এবং তৎপ্রসূত সামাজিক ঘটনাবলীর বিবিধত্ব ও জটিলত্ব এত মতিভ্রমজনক, যে, এই সংঘর্ষণোদ্‌বৃত্ত শক্তির গতি নির্দ্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

সভ্যতাব কোন স্তর কখন আবম্ভ হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা যেমন কঠিন, উহা কখন শেষ হইযাছে তাহা নির্দ্ধারণ করাও তেমনি কঠিন। যে শক্তি সমবায় পার্থিব মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত করে তাহারা অস্তিত্বহীন হইলেও উহাদের বেগাবশেষ সমাজকে সম্মুখের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে। এই রূপে অনেক সময়ে প্রথম স্তবেব সভ্যতা দ্বিতীয় স্তরে প্রসূত হয়, এবং দ্বিতীয় স্তরের সভ্যতা অনেক সময়েই তৃতীয় স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

স্তরের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যুগের সম্বন্ধেও খাটিবে। বাস্তবিক স্তর কিম্বা যুগ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং কখন কোন যুগের আরম্ভ বা শেষ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাজেই তাহা অনেকটা অনুমান সাপেক্ষ, বিশেষত, যে সকল লেখাদি হইতে ঐ সম্পদ নিরূপণের উপকরণ সংগৃহীত হয় তাহারা এত অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ ও অবিশ্বাস্য যে, ঐ সময়গুলি নির্দিষ্ট সমাজগুলির কাছাকাছি হইবে, ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই অনুমিত হইবে যে মনুষ্যের উন্নতি অবাধ গতিতে চলে নাই। তৃতীয় স্তরে গতি অপেক্ষা সামঞ্জস্যের দিকেই অধিক দৃষ্টি পড়ে। অতএব যে সভ্যতা ঐ স্তরে উঠিয়াছে পরবর্ত্তী যুগনিচয়েও উহা অনেকটা স্থিতিশীল হইয়া থাকে; এবং নবোত্থিত সভ্যজাতিরা তত্তৎযুগের প্রথম প্রথম স্তরে স্বভাবতঃ নিম্নতর সোপানে অবস্থান করে। কিন্তু এক যুগের কোন স্তরের সভ্যতা অপেক্ষা উন্নত এবং অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রসূত হইবেই, কারণ পরবর্ত্তী কালের সভ্যতা অনেক পরিমাণে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সভ্যতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যেমন দ্বিতীয় যুগের সকল অবস্থাতেই প্রথম যুগের সেই সকল অবস্থা অপেক্ষা সভ্যতার প্রসার বাড়িয়াছিল, এবং গুণেরও উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা সত্যই তৃতীয় স্তরে উপস্থিত হইবে তখন সে চেষ্টা তো হইবেই। বরং ইহাও সম্ভব যে ঐ আদর্শের স্থান এমন সব মহত্তর আদর্শ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে যে যাহার ধারণা এখনও আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না।

(প্রবাসী, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২০, পৃষ্ঠা - ৩৮৯ - ৯৬ — অনুবাদক - জীতেন্দ্রলাল বসু)

পরিশিষ্ট - এক

প্রমথনাথ বসু ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী

দীপক কুমার দাঁ ও সুবীর কুমার সেন

ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থেকে রাজস্থান, কাশ্মীর থেকে গোদাবরী - এই বিস্তৃত ভারত ভূখণ্ডে খনিজ আকরিকের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যে প্রথম ভারতীয়, তিনি হলেন ভূ-তাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসু (যিনি পি. এন. বোস নামেই বেশি খ্যাত ছিলেন।

তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন (১৯৫৫), 'আমার ধারণায় তিনি আমাদের [দেশের] প্রথমতম উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীদের একজন এবং এক মহান ভূতাত্ত্বিক। ভারতের এই পথিকৃত বিজ্ঞানী ও ভূতাত্ত্বিককে, যাঁর কাজ বহুভাবে সুফলপ্রসু হয়েছে, আসুন আমরা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি'। ('He was, I suppose, one of the earliest of our noted scientists and a great geologist. ... Let us pay tribute to this pioneer ecientist and geologist of India, from whose work so much good has resulted.)'

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই দেশ খ্যাত বিজ্ঞানী। এঁদেরও আগে আর একজন বাঙ্গালী বিলাত থেকে বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরে আসেন, তিনি ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু। প্রমথনাথের জীবনধারা কালে কালে তাঁকে বাঙ্গালা দেশের পূর্বাচার্যদের সমআসনে উঠিয়েছিল।

...প্রমথনাথ পেয়েছিলেন ভূতত্ত্ব বিভাগের উচ্চ চাকুরী। তখন এদেশে কেবল সাহেবরাই একাজে নিযুক্ত হতেন। ভারতের নানা অংশে ও ব্রহ্মদেশেও তিনি বহু রকম খনিজের আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরই আবিষ্কারের উপর জামশেদপুরের লোহার বিশাল কারখানার পত্তন হয়েছিল। তাঁরই আবিষ্কৃত লৌহের আকরগুলি হতেই আজ দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউড়কেলার কারখানাগুলিতে কাঁচামাল যোগান হচ্ছে। যে বেঙ্গল টেকনিকাল কলেজ আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, প্রমথনাথ বহুদিন এর কর্ণধার ও উপদেষ্টা ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান

শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৮৪ সনেই 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' শীর্ষক বই তিনি লিখেছিলেন। অত আগেও তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত।

[দ্রঃ মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত, 'আচার্য প্রমথনাথ' গ্রন্থের ভূমিকা।]

এই উদ্ধৃতি থেকে দুটি বিষয় ধরা পড়ে। (১) প্রমথনাথের ভূতাত্ত্বিক তথা বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম, গবেষণা ও সাফল্য, (২) শিক্ষা সংস্কার ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান। (৩) কিন্তু এছাড়াও আছে তাঁর অন্যবিধ (সৃজনশীল ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক) লেখালেখি। তাঁর রচনার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বিপুল। বর্তমান নিবন্ধে এই তিনটি বিষয়েই আলোকপাত করার চেষ্টা হবে।

জন্ম - বাল্যকথা - শিক্ষা

প্রমথনাথ বসুর জন্ম চব্বিশ পরগণার একটি পরগণা কুশদহের অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার গৈপুর গ্রামে। তারিখ ১২ই মে ১৮৫৫। খাঁটুরা, গৈপুর, গোবর ডাঙ্গার এই অঞ্চল বহু সুসন্তানের জন্মস্থান। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভারতে প্রথম বিধবা বিবাহ করে এক সমাজ বিপ্লব সম্পন্ন করেন। তিনটি পাশাপাশি গ্রাম এবং একটি সমৃদ্ধ ও প্রাচীন জনপদ। বাংলার রেনেসাঁসের আদি যুগেই এই এলাকায় আধুনিকতা ও প্রগতির ছোঁয়া লাগে, যদিও প্রাচীন ও নবীন সমাজবোধ পাশাপাশি বিরাজ করত। প্রমথনাথের পিতা তারাপ্রসন্ন বসু ছিলেন সরকারের জলপুলিশে কর্মরত। মাতার নাম শশিমুখী দেবী। নয় ভাইবোনের পরিবারে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় (প্রথম পুত্র)।

প্রমথনাথের স্কুল শিক্ষা শুরু হয় খাঁটুরার আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন ১৮৫৫ সনের মে মাসে প্রমথনাথের জন্মের সমকালে। তাঁর ঠাকুরদা নবকৃষ্ণ বসু কয়েক বছর পর (১৮৬৪) তাঁকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যান এবং বিখ্যাত কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি দশম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ষোল বছর বয়স না হওয়ায় এনট্রান্স (এখনকার মাধ্যমিক) পরীক্ষা সে বছর দেওয়া হল না। প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে তিনি পরের বছরের এনট্রান্স পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন (১৮৭১)। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৭৩-এ এফ এ (ফার্স্ট আর্টস, এখনকার উচ্চমাধ্যমিকের সমতূল্য) পরীক্ষায় তিনি পঞ্চম হন এবং কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন।

কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ সামুয়েল লব ও বিজ্ঞান শিক্ষক অম্বিকা চরণ সেন তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ওই দুজনই প্রথম প্রমথনাথকে

গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। প্রমথনাথ সারা ভারতে গিলক্রাইস্ট পরীক্ষায় (১৮৭৪) প্রথম স্থান অধিকার করে ৫ বছরের জন্য উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যাওযাব বৃত্তি লাভ করেন (বার্ষিক ১০০ পাউন্ড রাহা খরচ ও যাতায়াত ভাড়া সহ)। ১৮৭৪ সনের অক্টোবর মাসে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বি এসসি ক্লাসে। পড়ার বিষয় ছিল - রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন। চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম ও জীববিদ্যায় চতুর্থ স্থান দখল করেন। বি এসসি'র পরে তিনি রয়াল স্কুল অব মাইনসে ভর্তি হন (১৮৭৮)। এক বছর বাদেই চূড়ান্ত ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রাণীবিদ্যা ও প্রত্নজীববিদ্যায় (প্যালিওন্টোলজি) তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। বিখ্যাত অধ্যাপক টি. এইচ. হাক্স্লির সংস্পর্শে আসেন এখানেই। প্রমথনাথ সংকল্প করেন ইংলন্ড থেকেই চাকুরি নিয়ে দেশে ফিরবেন।

এদিকে গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ শেষ হয়ে গেল ১৮৭৯-তে। প্রমথনাথ কোচিং ক্লাসে ছাত্র পড়িয়ে এবং ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে অর্থোপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলতে শুরু করে। ইংলন্ডে থাকাকালীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ক্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বক্তৃতা ও লেখালেখি শুরু করেন। বিলেতে ভারতীয়দের সমস্যা মোকাবিলা ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অব্যবস্থা তুলে ধরার জন্য ইন্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সোসাইটির সম্পাদক হন এবং দাদাভাই নৌরজি, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। ব্রিটিশ সরকার এসব কাজ ভাল বিবেচনা করলেন না। ভারত সচিব তাঁকে চাকুরিতে নিয়োগ করে ভারতে ফেরৎ পাঠানোই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। প্রমথনাথেব জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হোল। এক মহান দেশ সেবকের অক্লান্ত কর্ম সাধনা।

ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ

১৩ই মে ১৮৮০ থেকে ১৫ই নভেম্বর ১৯০৩ - এই ২৪ বছর তিনি সরকারি কাজে নিযুক্ত থেকেছেন। শীতের ছয় মাস তাঁবু খাটিয়ে, ঘোড়ার পিঠে, উটের পিঠে, নৌকারোহণে দুর্গম প্রান্তর, অরণ্যে, পাহাড় পর্বতে খনিজ অনুসন্ধান করতেন (ফিল্ড সার্ভে)। বাকি ছয় মাস কলকাতার অফিসে বসে গৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হত। এই সময়কালে রেকর্ডস অব জি এস আই-তে তেরটি গবেষণাপত্র ও গ্রন্থাকারে একটি মেমোয়ারস্ - ছাপা হয়। মধ্য-প্রদেশের 'ধূলি' ও 'রাজহরাতে' আকরিক লোহা, 'রায়পুরে' লিগানাইট কয়লা, 'দার্জিলিঙে' কয়লা, 'সিকিমে' তামা, 'বরাকর-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে' অভ্র, 'জব্বলপুরে' ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ, 'ব্রহ্মদেশে' কয়লা ও গ্রানাইট পাথর, 'রায়পুর' জেলার পশ্চিমাংশে লৌহ

খনিজ, 'রাইপুর' ও 'বালারঘাটে' আগ্নেয় শিলা, 'নর্মদা নদীব নিম্নাংশেব' খনিজ সম্পদ ইত্যাদি আবিষ্কাব ভারতের শিল্প সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে সাহায্য করেছে। আসামেব খাসিমাব এলাকায তিনি তৃতীয় দশার বালুশিলা হতে পেট্রোলিয়াম চুঁইযে বের হতে দেখেন (১৯০০-০১ এর সমীক্ষা পর্বে)। যদিও আসামেব অন্যত্র খনিজ তেলেব সন্ধান ১৮৪০ সালের আগেই পাওযা যায়।

তাঁর চাকুরীতে প্রবেশের সময়ে জি এস আই-র বড়কর্তা (সুপাবিনটেন্ডেন্ট) ছিলেন মেডলিকট সাহব। সাত বৎসব পর প্রেমোশন পেয়ে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট হন। এই সময় দুবছর তাঁকে কার্যকাবী (acting) সুপারিনটেন্ডেন্টের পদে বহাল করা হয়। কিন্তু ওই পদে তাঁকে পাকা কবা হল না। সবকাবি নিযমে লভ্য দু বছরের সচেতন ফার্লো ছুটি নিলেন (১৫।৫।১৮৯৫ - ১৪।৫।১৮৯৭)। ফিরে এসেও তাঁকে আর কোন প্রোমোশন না দিয়ে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পদেই বহাল বাখা হোল। তাঁর থেকে দশ বছবের জুনিয়ার টমাস হেনরি হল্যান্ডকে সর্ব্বোচ্চ পদ দেওযা হলে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে চাকুরি থেকে পদত্যাগ করলেন। বস্তুত, ছজন পুরনো (সিনিয়ব) অফিসারকে টপকে হল্যান্ডকে নিয়োগ করা হয়েছিল। মাত্র ৪১৩ টাকা সবকারি পেনশনে বাকি জীবন (১৯০৩ থেকে ১৯৩৪-এ মৃত্যু অবধি) তাঁকে কাটাতে হয়েছে।

১৯০৩ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি উড়িষ্যার ময়ূবভঞ্জ রাজ্যেব খনিজ অনুসন্ধানে (স্টেট জিওলজিস্টরূপে) যোগ দেন। এখানে করেন তাঁর জীবনেব সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার : গরুমহিষানিতে লৌহ আকরিকেব ভান্ডার। এই আকরিকের গুণমান ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ের। তিনি টাটা কোম্পানির কর্ণধার জামসেদজী নাসেরওয়ানজি টাটাকে চিঠি লিখলেন - ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪। ঐতিহাসিক পত্র। (পৃঃ ১৪১ দ্র.) উল্লেখ করা যায়, টাটা কর্তৃপক্ষ তখন ভাবতে একটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা গড়তে উদ্যোগী হয়েছেন। উপযুক্ত জায়গা খুঁজছেন। আমেরিকান বিশেষজ্ঞ সি. পি. পেরিন ও সি. এম. ওয়েলড্‌কে কারিগরী পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছেন। মধ্যপ্রদেশেব ধূলী - রাজহরা এলাকায় কারখানা গড়া প্রায় নিশ্চিত, এমন সময় টাটাদের কাছে চিঠি পৌঁছল পি, এন, বোসের; অনুরোধ - দেখে যান গরুমহিষানির আকরিক সম্পদ। বোসের নাম টাটাদের এবং তাঁদের পরামর্শ দাতাদের অজানা ছিল না। কারণ মধ্যপ্রদেশের লৌহ আকরিক ভান্ডারের কথা তাঁরা জানতে পেরেছিলেন পি. এন. বোসেরই গবেষণা পত্র থেকে। কাজেই টাটারা বোসের চিঠিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জামসেদজী টাটা তখন অসুস্থ। প্রমথনাথের চিঠি পাওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ছেলে দোরবজী টাটাকে নির্দেশ দিয়ে যান পি এন বোসের প্রস্তাবিত জায়গাটি সরেজমিনে অনুসন্ধানের জন্য। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হোল সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদীর সঙ্গমের কাছে সাকচিতে (বর্তমান জামশেদপুর) গড়া হবে টাটা আয়রণ

অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস। এই সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক পি এন বোস, যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে মূল চালিকাশক্তির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কারখানা প্রতিষ্ঠার তারিখ - ১৯০৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি।

টাটা কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিনামূল্যে কোম্পানীর শেয়ার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিনম্র চিত্তে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থের উদ্দেশ্যে তিনি কখনো কোন কাজ করেন নি। ভারতীয় জীবনাদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। টাটা কোম্পানী জামশেদপুর ও গরুমহিষানিতে তাঁর স্মৃতি রক্ষায় সহায়তা করে সম্মান জানিয়েছেন। ভারতে ভারতীয়দের দ্বারা আধুনিক শিল্প স্থাপনের অন্যতম প্রধান কুশীলবের কীর্তি প্রমথনাথের।

বিবাহ ও পরিবার

প্রমথনাথের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সম্পর্কে বলে নেওয়া ভাল। কালাপানির দেশে যাওয়ায় প্রমথনাথের জাত গেছে - এই ঘোষণা করেন তাঁর জন্মস্থানের সমাজপতিরা। প্রমথনাথ বলেন, সমুদ্র পেরোলে জাত যায়, এই কথা মানি না। সমাজপতিদের কাছে তিনি মাথা নোয়ান নি। ১৮৮২ সালে ২৪শে জুলাই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় হিন্দুমতে। রমেশচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম। সেই সময় ব্রাহ্ম বিবাহ যথাবিহিত বৈধ করার জন্য 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' (চলতি কথায় 'তিন আইন') চালু হয়, প্রধানত নব্য ব্রাহ্ম নেতা কেশব চন্দ্র সেনের চেষ্টায়। কিন্তু এই আইনসিদ্ধ বিবাহে বর-বধূকে সই করে ঘোষণা করতে হত তাঁরা কোন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী নন। কিন্তু প্রমথনাথ বলেন, আমি তো জাতি বা ধর্ম ত্যাগ করিনি। ঠিক হলো বিয়ে হবে হিন্দু-প্রথায়। পুরোহিত পাওয়ার ঘোরতর সমস্যা দেখা দিল। শেষমেশ তাঁর গৈপুর গ্রামের বাড়ির কুল পুরোহিত বিবাহের সব দায়িত্ব পালন করলেন। উল্লেখ করা যায়, বিয়ের মাস ছয়েক আগে প্রমথনাথ কমলার সঙ্গে পরিচিত হন রমেশচন্দ্রের বাড়িতেই। কমলাদেবীর কাকা অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় বিলেতে। কলকাতায় ফেরার পর অবিনাশচন্দ্র বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। পরিচয় থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে পরিণয়। আজও কমলাদেবীর স্মৃতি রক্ষা করছে কলকাতার কমলা গার্লস স্কুল।

এই বিবাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। এই বিবাহ সভায় প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র ও তরুণ রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিমন্ত্রিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন, 'রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ্য কন্যার বিবাহ সভায় দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি

সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'না'। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইলাম।' অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ একই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনো সভায় তিনি নিজকণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্য-চর্চার গৌরবের দিন'।

বিবাহটি যথেষ্ট সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কারণ বিলাত-ফেরত শ্বশুর ও জামাতা কেউই প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হননি। এবং রেজিস্ট্রি বা তিন আইনে বিবাহ না করে প্রমথনাথ বিবাহ করেছিলেন হিন্দু মতে। অদ্ভুত ব্যাপাব, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিবাহের বরের নাম করেননি! অথচ ১৮৭৯-৮০তে বিলাত থাকাকালীনই উভয়ের পরিচয় হয়।

প্রমথনাথ - কমলার নয় পুত্র-কন্যা (৪ পুত্র; ৫ কন্যা; বিখ্যাত চলচিত্র পরিচালক মধু বসু তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র)। পুত্রেরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। দুই পুত্র - অশোক, অলোক - বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই অল্প বয়সে প্রমথনাথ, কমলার জীবদ্দশায় মারা যান। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুষমা সেন পাটনা থেকে প্রথম লোকসভার (১৯৫২) এম পি হয়েছিলেন। ছোট বেলায় তাঁর পুত্র-কন্যারা ঠাকুরবাড়ির এবং কলকাতার অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পাবিবারিকভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের বাড়িতে গান গেয়েছেন এমন ঘটনাও আছে। অথচ, রবীন্দ্রনাথের রচনায়, চিঠিপত্রে কোথাও প্রমথনাথের উল্লেখ দেখা যায় না।

সমাজ, শিল্প ও শিক্ষা সংস্কার

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও প্রমথনাথ যুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৯১-তে কলকাতায় ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ সম্মেলনের (Indian Industrial Conference) ভিত্তি স্থাপন করেন প্রমথনাথ। একাধিক স্বদেশী শিল্প গড়েছেন। আসানসোলে কয়লাখনি পরিচালনা করেন, পূর্ব ভারতের প্রথম আধুনিক সাবানের কারখানা স্থাপন করেছিলেন, খনিজ প্রসন্ধানের জন্য কোম্পানী গড়েন। তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সঙ্গে একত্র কাজ করেছেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্‌টিটিউট গড়ায়, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজকর্মে, ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভায় ইত্যাদি। অথচ, এঁদের কারো কোনো রচনায়, চিঠিপত্রে প্রমথনাথের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না।

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার আধুনিকীকরণে প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ১৮৮৬ সালে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন — Technical and Scientific

Education in Bengal এই নামে। এই পুস্তিকাটি সেই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮৭তে প্রমথনাথ মহেন্দ্রলাল সবকার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্সে ভূতত্ত্বের উচ্চ পর্যায়ের পাঠন শুরু করেন। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা বেশি না হওয়ায় কোর্সটি সে সময় বন্ধ হয়ে যায়। এর বেশ কয়েক বছর পর (১৮৮৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি এ (বি এস সি) ও এম এ ডিগ্রি প্রচলন করেন। এ বিষয়ে সরকারী পঠন পাঠন শুরু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৯০-তে। ১৯০১-০৩ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। সরকারি চাকুরির দায়িত্ব মেটানোর পাশাপাশি এই অধ্যাপনার কাজ চালাতে হোত। ১৯০১-০৬ পুনরায় ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভায় ভূতত্ত্বের অধ্যাপনা করেন।

১৯০৬ এর পয়লা জুন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বঙ্গীয় কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়। ওই বছর ২৫শে জুলাই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিটিউট (BTI) কাজ শুরু করে। BTI-এর প্রথম অধ্যক্ষ (Principal), পরে প্রথম রেক্টর হন। ১৯১০ সালের ২৫শে মে উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানই সংযুক্ত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নামে এবং সাহিত্য শাখা তুলে দিয়ে কারিগরী ও বিজ্ঞান শাখাই রাখা হয়। ১৯২৯-এ পরিষদের কলেজের নাম হয় 'কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, যাদবপুর'। ১৯৫৫-তে এই কলেজই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিগণিত হয়। বঙ্গদেশে কারিগরী শিক্ষার বিস্তারে প্রমথনাথের অবদান সর্বাগ্রে।

১৯১৯-২০ সালের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্য বিবরণীতে আছে 'বহু বৎসর ধরে শ্রী পি এন বোস, বি এসসি (লন্ডন) অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে কাউন্সিলের 'মহাধ্যক্ষ' ('রেকটার') এর দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এবং এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রসূত ব্যবস্থাপনা সার্থক করার ব্যাপারে মূল্যবান সহায়তা করেছেন। ১৯২০ সালের জুলাইতে শ্রী পি এন বোস রেকটর পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে পদত্যাগ করেন - কারণ, তাঁর নিজের কথায়, 'কলকাতা থেকে দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি'। কার্যকরী সমিতি তাঁদের ছাব্বিশে জুলাই (১৯২০) তারিখের মিটিং-এ কাউন্সিলের কাজে তাঁর মূল্যবান অবদান উচ্চ প্রশংসাসহ নথিবদ্ধ করেন।' (" For many years Mr. P.N.Bose, B.Sc (London) had field the Office of Rector of the Council with great distinction and rendered it valuable assistance in the carrying out of its schemes of studies. ..... In july, 1920 Mr. P.N. Bose was obliged to resign the Office of Rector owing to, to use his words, prolonged absence from Calcutta. The committee at their meeting held on the 26th July, 1920 placed on record their high appreciation of his valuable service to the council.") বি. টি.

আইয়ের ক্রম উন্নতিতে প্রমথনাথের অবদান কম নয়। রেকটর হিসাবে তাঁর বক্তৃতাগুলিই তার নিদর্শন।

ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক

১৮৮৪ সালে প্রমথনাথ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করেন - কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত তিন খন্ডের ইতিহাসের বিজ্ঞান খন্ডটি সম্পদনা ক'রে (প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা) - মাত্র ২৯ বছর বয়সে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রমথনাথের ব্যুৎপত্তি এই সম্মান লাভের সুযোগ এনে দেয়। চিন্তাশীল লেখক প্রমথনাথ এক বিরাট ঐতিহ্য রেখে গেছেন। তিন খন্ডে প্রকাশিত - A History of Hindu Civilisation during British Rule (১ম ও ২য়, ১৮৯৪; ৩য়, ১৮৯৬) তাঁর এক অনন্য কীর্তি। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা ৩০-এর বেশি। পুস্তকাকারে অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যা প্রচুর, যার মধ্যে আছে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও মহাত্মা গান্ধীকে লেখা ষোলটি খোলা চিঠি (রচনাপঞ্জি দ্রষ্টব্য)। এই আত্মজীবনী ও খোলা চিঠিগুলি ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রমথনাথের প্রথম গবেষণাপত্র দুটির বিষয় ছিল প্যালিওন্টোলজি বা প্রত্নজীববিদ্যা। হিমালয়ের পশ্চিমমুখী বিস্তারের নাম শিবালিক পাহাড়। এর শুরু মোটামুটি হরিদ্বারের পর থেকে এবং বিস্তার জম্মু পর্যন্ত। এই এলাকাটি ফসিল সমৃদ্ধ। তিন ধরণের নরবানর জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম এই অঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছে - যাদের নাম দেওয়া হয়েছে শিব-পিথেকাস, ব্রহ্ম-পিথেকাস আর রাম-পিথেকাস। এই এলাকায় অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জীবাশ্মেরও প্রাচুর্য দেখা যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত এমনই কয়েকটি ফসিলের টুকরো নিয়ে প্রমথনাথ কাজ করেন এবং এই প্রাণিদের শ্রেণীবিভাগ করেন, কয়েকটি নতুন নামও দেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৮০ ও সেপ্টেম্বর ১৮৮০)।

প্রমথনাথের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি ভাষায়; অতি সামান্যই বাংলায় (পরিশিষ্ট-১ এর তৃতীয় রচনা দ্র.)। তাঁর ইংরেজি রচনার ভাষা ভিক্টোরিয় ইংরেজির ছাঁচে ঢালা, ঋজু, সুখপাঠ্য গদ্যে লেখা। রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা, বাণিজ্য সম্পর্কিত রচনাগুলি সুগভীর মনস্বিতায় ভরপূর।

প্রয়াণ ও স্মরণ

১৯০৭ সালে রাঁচীতে ২১ বিঘা জমির উপর বাড়ি নির্মাণ করেন, মৃত্যু অবধি (২৭শে এপ্রিল ১৯৩৪) তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী ছিলেন অশেষ গুণবতী। স্বামীর সঙ্গে তিনি বহু দুর্গম খনিজ সন্ধানে সঙ্গী হয়েছেন। তাঁরা

উভয়েই রাঁচীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। দেশসেবক প্রমথনাথ নীরোগ দেহে ৭৯ বছরের এক বর্ণাঢ্য জীবন সমাপ্ত করেন।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান চর্চার ও সামাজিক সাংস্কৃতিক চিন্তার মানচিত্রে প্রমথনাথ উজ্জ্বল রত্ন হয়েও আজ বিস্মৃতি, বিস্বীকৃতি ও অবহেলার শিকার। ১৮৮০ সালে তাঁর গবেষণা পত্র দুটি কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বিজ্ঞান গবেষণা পত্র। এশিয়াটিক সোসাইটি, জি এস আই ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে। তিনি লন্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো (১৮৭৯) ছিলেন। জি. এস. আই-এর লবণ হ্রদ (বা সল্ট লেক বা বিধান নগরে) নবনির্মিত ভবনের সভাগৃহটি প্রমথনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রতি দু বছর অন্তর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদকে পি. এন. বোস মেডেল দেওয়া হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব অণার্স ও এম. এস. সির প্রথম স্থানাধিকারীকে পি. এন. বোস পুরস্কার দেওয়া হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মর্মর মূর্তিটি সত্তর দশকের গোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজও তাঁর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রমথনাথের ইংরেজি রচনার পুনর্মুদ্রণ আশু জরুরি। তাঁর কথা নতুন প্রজন্মের ভারতীয়রা জানুক। খনিজ শিলা সমৃদ্ধ ভারতের এক মহান আধুনিক রূপকার প্রমথনাথ সম্পর্কিত চর্চা নতুনভাবে বিকশিত হোক।

রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

প্রবাসী, ১৩৪১, কার্ত্তিক - চৈত্র, ৩৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯

অনেকে জানেন মিষ্টার পি, এন বোস (প্রমথনাথ বসু, প্রায় এক বৎসর স্বর্গগত) ময়ূরভঞ্জে লোহার আকর আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সে আবিষ্কারের ফলে টাটা কোম্পানীর বিপুল কারখানার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অনেকে জানেন না, বসু মশায় কি সূত্রে ময়ূরভঞ্জে এসেছিলেন। বসু মশায়ও আদি বৃত্তান্ত জানতেন না। তিনি ইং ১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে গবর্ণমেন্ট ভূ -বিদ্যা বিভাগের কর্ম হতে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, ডিসেম্বর মাসে রাজার ভূবিদ্যাবিদ হয়েছিলেন। তার পর ময়ূরভঞ্জের গোরুমহিষাণি পাহাড়ে লোহার আকর দেখতে পান।

আদি বৃত্তান্ত একটু লিখি। ইং ১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসে মধুসূদন দাস[১] -মশায়ের উদ্‌যোগে কটকে ওড়িষ্যার শিল্প-দ্রব্যের প্রদর্শনী হয়। এইটি প্রথম। সে সময়ে রাজা[২] কটক এসেছিলেন। উদ্‌যোক্তারা রাজাকে ও আমাকে এক দ্রব্য-জাতের ভালমন্দ বিচারক করেছিলেন। ১২টার সময় যেতে হবে। আমি একটু আগে যেয়ে সব দ্রব্য একবার দেখে রাখলাম। প্রায় পনর আনা নানা গড়[৩] হতে এসেছে। একস্থানে চার হাঁড়ী কাল গুঁড়া মাটি ছিল। মাটি কোথা হতে এসেছে, তাতে কি আছে, জেনে রাখলাম। ১২ টার সময় রাজা এলেন। তাঁর সঙ্গে আবার সব দেখতে লাগলাম। নানা প্রকার বস্ত্র, লোহার অস্ত্রশস্ত্র, পিতল কাঁসার তৈজসপত্র ইত্যাদি ছিল। ময়ূরভঞ্জ হতেও এসেছিল। আমরা এক একটি দেখি গুণপনার প্রশংসা করি। এক একটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর, বর্তমান চোখে সব সুন্দর নয়। কিন্তু কত কালের উদ্যমে ও সাধনে কলার তেমন উৎকর্ষ হয়েছে! আমি রাজাকে এক একটা দেখাই, আর বলি, 'রাজা, এই যে কলা, একি লুপ্ত হবে ? এই যে কৌশল, একে একটু নূতন পথে চালিয়ে দিবার কেহ নাই কি ?' দ্রব্যগুলি রাজার কাছে নূতন ছিল না, কিন্তু তিনি গুণপনা ভেবে দেখেন নি। পরে সেই চার হাঁড়ির কাছে এলাম। একটু কৌতুক করে রাজাকে বললাম, 'রাজা, গড়জাতী বুদ্ধি দেখেছেন, মাটি পাঠিয়েছে!' রাজাও দেখলেন মাটি। একটা হাঁড়ি তুলে বললেন,

'ভারী ঠেকছে, মাটিতে কিছু থাকবে।' 'এক হাঁড়ী মাটি ভারী ত হবেই।' কিছু মাটি নিয়ে দেখালাম সোনার আঁষ চিক্‌চিক্ করছে। কেরানী কাছে দাড়িয়েছিল, 'বল ত কোথা হতে এসেছে।' 'এই দু-হাঁড়ী ময়ূরভঞ্জ হতে, এই দু-হাঁড়ী অমুক গড় হতে।' সোনা ও ময়ূরভঞ্জের নাম শুনে রাজার আগ্রহ হল। জায়গার নাম শুনে বিশ্বাস হল। 'তাইত, সেখানে সোনা পাওয়া যায়, আমি জানতাম না।' 'কে জানবে ? ময়ূরভঞ্জ রাজ্য আপনার। আমার মনে করলেও আপনার ক্ষতি হবে না।' রাজা অবশ্য মর্ম বুঝলেন।

এর প্রায় পাঁচ - ছয়মাস পূর্ব হতে আমি কুম্ভকলা জানতে বসেছিলাম। আমি তখন বাসায় কুম্ভকার। এই কাজের নিমিত্ত একটা পাথর খুঁজছিলাম। পাথরটা ইংরাজীতে ফেলস্‌পার (Felspar), বোধ হয় সংস্কৃত নাম চপল। কটকের নিকটের পাহাড়ে পেলাম না। তালচেরের রাজাকে (বর্তমান রাজা), কেওঝরের মহারাজা ও ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনাপত্র লিখলাম, তাঁদের রাজ্যে যত রকম পাথর আছে অনুগ্রহ করে এক এক টুকরো পাঠিয়ে দেবেন। সংক্ষেপে বাহ্যলক্ষণ দিয়েছিলাম। তথাপি এই বুদ্ধি করতে হয়েছিল। কারণ, থাকলে দেশী নাম থাকবে, সে নাম আমি জানি না, সকলে বাহ্যলক্ষণ বুঝবে না, নমুনা পাঠালে খাঁটি কিলাস (Crystal) খুজবে, না পেলে 'নাই' বলবে। ইং ১৯০১ সালের মার্চ মাসে পত্র লিখি। তিন চার মাস মধ্যে তালচের ও কেওঝর পাথরের অনেক টুকরো পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু, একটাও চপল নয়। রাজা শ্রীরামচন্দ্র আমার পত্র পেয়েই লিখলেন, তিনি এক ভূবিদ্যাবিদ দ্বারা ময়ূরভঞ্জের কিয়দংশ পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন, কিন্তু কাজ ভালো হয় নাই, স্থগিত রাখতে হয়েছে, অবসর পেলেই আবার করাবেন। আরও লিখলেন, তাঁর এক শিলা-সংগ্রহ আছে। আমার দেখবার তরে তিনি সেটি পাঠাতে পারেন, কিন্তু দিতে পারবেন না। আমি পত্র পেয়ে আহ্লাদিত হলাম, শিলা সংগ্রহ পাঠিয়ে দিতে লিখলাম। রাজা লিখলেন, 'তাইত। খুজে পাচ্ছি না। কোথায় গেল, কেউ বলতে পারছে না, মোহিনীবাবু[৪] জানতে পারেন, তাঁকে লিখবেন।' মোহিনীবাবুকে লিখলাম, তিনি শিলা সংগ্রহ দেখেন নি, পাথর টাথর চিনেন না। তিনি অরণ্য বিভাগের এক কর্মচারীকে পরোয়ানা পাঠালেন, আমার যখন যে পাথর দরকার হবে, তিনি পাঠিয়ে দেবেন। অগত্যা আমাকে এক পত্র লিখতে হল, কিন্তু ছ-মাস পরে ইনি সেরখানেক ওজনের স্ফটিকের একটা কিলাস পাঠিয়ে দিলেন। আমি হতাশ হয়ে আক্ষেপ করে রাজাকে লিখলাম, 'রাজা আপনার রাজ্যে কোথায় কি আছে, কেহ জানে না, চিনে না।'

সে বৎসর বোধ হয় এপ্রিল মাসে টি চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কথায় বুঝলাম, রাজা এঁকেই শিলা সংগ্রহে নিযুক্ত করেছিলেন। এঁর লম্বা লম্বা কথা শুনে আমার শ্রদ্ধা হল না। ইনি সীসার আকর 'গেলেনা'র

(Gelena) কিলাস দেখালেন, ময়ূরভঞ্জে পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস হল না। রাজা মূর্খ নহেন যে এই আবিষ্কারের মূল্য বুঝতে পারেন নাই। চৌধুরী মশায়ের ইচ্ছা আমি রাজাকে পত্র লিখি, ইনি যোগ্য লোক, এঁকে রাখলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি অবশ্য লিখলাম না।

সে সময়ে আমি বালেশ্বরের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের নিকট হতে পোয়াটাক ভারী একটা কাল পাথর পেয়েছিলেম। তাতেও আমার খানিক কাজ চলতে পারত। পত্র লিখে জানলাম রাজা বাহাদুর রাজা শ্রীরামচন্দ্রের এক আলমারিতে পেয়েছিলেন। রাজাকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছুই জানেন না। দৈবক্রমে কিছুদিন পরে দুই রাজা কটকে এসেছিলেন, একত্রে ছিলেন। আমি পাথরটি নিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে গেলাম। রাজা শ্রীরামচন্দ্র বলেন, তিনি সে পাথর কখনও দেখেন নি, রাজা বৈকুণ্ঠনাথ বলেন, অমুকঘরের অমুক আলমারিতে ছিল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে বলালম, 'রাজা, আপনার কত শিলা হারিয়ে যাচ্ছে, আপনি দেখছেন না।' (পাথরটা আমায় ভারি ভুগিয়েছিল। বস্তুত সেটা কৃত্রিম কাচ।

রাজা গড়ে গিয়ে মাসখানেক পরে আমাকে পত্র লিখলেন, তিনি ইণ্ডিয়া গবর্মেন্টের কাছে একজন ভূবিদ্যাপ্রাজ্ঞ চেয়েছিলেন, কিন্তু গবর্মেন্ট কাকেও দিতে পারেন নাই, সম্প্রতি কেহ উদ্‌বৃত্ত নাই। প্রমথনাথ বসু মশায় রাজার পত্র দেখে থাকবেন, এবং সরকারী কর্ম হতে অবসর পেয়েই ময়ূরভঞ্জ এসেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, লোহার আকব আবিষ্কার করতে তাঁকে তেমন কষ্ট করতে হয় নি। পূর্বে ওড়িষ্যার তিন চার রাজ্যে আকর হতে লোহা কাড়া হত; ময়ূরভঞ্জ হতেও হত। কোথায় হত, বসু মহাশয় দেখতে পান। বিলাতী লোহা এলে এদেশের লোহার নাম দেশী লোহা হয়েছিল। দেশী লোহা 'টান লোহা', এর আদর ছিল। কামারকে কাটারী গড়তে দিলে সে দেশী লোহা দিয়ে কাটারীর ধার করত। কেওঝরের দেশী লোহায় সেতারের তার হত, কটকে কিনতে পাওয়া যেত। নিজাম হায়দারাবাদের তার উৎকৃষ্ট ছিল। অনেক কাল পর্যন্ত তালচের রাজ্যে ও বামড়া রাজ্যে দেশী লোহা পাওয়া যেত। বাঁকুড়া জেলায় লোহার নামে এক জাতি আছে। তারা জানে না, তাদের পূর্বপুরুষ দেশে লোহা যোগাত। সস্তা বিলাতী কাপড় এসে তাঁতীর অন্ন মেরেছে। সস্তা বিলাতী লোহা এসে লোহারের অন্ন মেরেছে।

টীকা ঃ

১. কটকের তখনকার একজন সমাজহিতৈষী গণ্যমান্য ব্যক্তি।

২. ময়ূরভঞ্জের রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে যোগেশচন্দ্র রায় বি দ্যানিধির ছাত্র ছিলেন।

৩ ওড়িশার এক একটি 'গড' নিয়ে এক একটি ছোট রাজ্য ছিল। এদের 'গড়জাত মহাল বলা হত। বিশেষণে 'গড়জাতি'।

৪ মোহিনী মোহন ধর। র্যাভেনশ কলেজে যোগেশচন্দ্রের সহকর্মী, গণিতের অধ্যাপক (১৮৮৮ ৮৯) ছিলেন। তিনি রাজার আইন উপদেষ্টা ও গৃহশিক্ষকরূপে ময়ূরভঞ্জ যান। পরে রাজা তাঁকে 'দেওয়ান' বা মুখ্যমন্ত্রী করেন। শোনা যায় ইনিই প্রমথনাথকে ময়ূরভঞ্জ আনার ব্যবস্থা করেন।



প্রমথনাথ বসুর বাঁচির বাড়ি

প্রমথনাথ বসুর বাংলা চর্চা ও রচনার প্রসঙ্গ

সুবীর কুমার সেন

প্রমথনাথ বস সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের জানার প্রধানতম সূত্র যোগেশচন্দ্র বাগলের লেখা প্রমথনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত ইংরিজি জীবনী গ্রন্থ 'প্রমথনাথ বোস' (৩৩ + ২৫৫ পৃঃ) এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত (১৬ + ৬৬ পৃঃ) একটি ক্ষুদ্র জীবনী পুস্তিকা — 'আচার্য প্রমথনাথ বসু'। এই বই দুটিও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। প্রমথনাথেব ইংরিজি রচনার পরিমাণ বিপুল। তুলনায় বাংলা রচনাব পরিমাণ অল্প। সে যুগের রীতি অনুযায়ী চিঠিপত্র লিখতেন ইংরিজি বাংলা উভয় ভাষাতেই। সে সব চিঠিপত্রের প্রায় কিছুই রক্ষিত হয়নি। যদিও স্ত্রী কমলাদেবী যথেষ্ট ইংরিজি শিক্ষিত ছিলেন, তাঁকে চিঠি লিখতেন বাংলায়। আবাব শ্বশুর মশাই রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, অনুরাগী এবং বাংলা ঔপন্যাসিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চিঠি লিখতেন ইংরিজিতে। লক্ষ করার বিষয়, প্রমথনাথ অন্তত প্রথম জীবনে বাংলা চর্চায় উৎসাহিত ছিলেন। তাঁর বেশীর ভাগ বাংলা রচনার কাল ১৮৮৩-৮৪ থেকে ১৮৯৩-৯৪ — এই এক দশক। এর শেষ পর্ব থেকে প্রমথনাথ তাঁর মহাগ্রন্থ 'হিস্টরি অব হিন্দু সিভিলাইজেশন আন্ডার ব্রিটিশ রুল' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। যদিও মনে হয় এই বইয়ের প্রথম দুটি খন্ডের মাল মশলা সংগৃহিত হয়েছিল আগে হতেই। এটিও লক্ষ করার বিষয় তাঁর গবেষণা নিবন্ধ ও অন্যান্য ইংরিজি রচনার সর্বাধিক উৎসার কালও ঐ ১৮৯৩ পর্যন্ত। ১৮৯৪ হতে ১৯০৩-৪ পর্যন্ত তাঁর কোন বাংলা লেখা নেই। পরেও প্রায় নেই। ঐ দশ বছর 'হিস্টরি' ছাড়া ইংরিজি লেখার পরিমাণও অত্যল্প। কিন্তু ১৯০৩ এ পর তাঁর পাঁচটি গবেষণা প্রবন্ধ বের হয় ভূতত্ত্বের উপর। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরিজি রচনাও। ১৯০৯ এর পর তাঁর ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কোন রচনা নেই। অবশ্য ময়ূরভঞ্জ রাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব (১৮৭১-১৯১২) মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রয়াত হলে প্রমথনাথ তাঁর রাজকার্য ত্যাগ করেন। তারপরও প্রমথনাথের লেখনি থেকেছে যথেষ্ট গতিশীল। মৃত্যুর দু-এক দিন আগে পর্যন্তও তিনি লিখেছেন। কিন্তু সে সমস্তই ইংরিজিতে সামাজিক বিষয় নিয়ে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বক্তৃতাও ইংরিজি লেখার অনুবাদ। তাঁর মৌলিক বাংলা রচনার কোন হদিশ তাঁর জীবনের শেষ চার দশকে অমিল।

মনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁর বইতে প্রমথনাথের কয়েকটি বাংলা রচনার উদ্ধৃতি

দিয়েছিলেন, যা বাগলের বইতে নেই। প্রমথনাথের ৩৪ বছর বয়সে লেখা (১৮৮৯) একটি বাংলা বচনা 'হিমালয়ে একটি নীহার বাহুর পাশে' (বিবিধ প্রবন্ধ, গ্রন্থে সংকলিত, বর্তমান সংকলনের তৃতীয় রচনা) থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃতি দিয়েছেন গুপ্ত — 'অসংখ্য জীবের অশেষ হিত করিয়া পরে তুমি অনন্তসাগরে মিশিবে। তখন দৃশ্যতঃ তোমার জীবনের শেষ হইল বটে, নদীর নদীত্ব গেল বটে, কিন্তু তখনও বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইল না, মহাসমুদ্রে বিলীন হইলে মাত্র। মহাসমুদ্র তোমার জন্মদাতা। তিনি আপনার শরীর হইতে জলীয় বাষ্প হিমালয়ে প্রেরণ করিযাছেন। ঐ জলীয় বাষ্প উচ্চশৃঙ্গে তুষাররূপে সংহত হইয়াছে। এই বরফ হইতে তোমার জন্ম। তোমার জীবনের শেষ হইলে জন্মদাতার ক্রোড়ে লুকাইলে।

'নদি, তোমার জীবন আদর্শ জীবন। মানবজীবনের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তোমার জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত যেরূপ দেখিতে পাই মানব জীবনের আদি অন্ত সেরূপ দেখিতে পাই না। মানব জীবনেরও কি বাস্তবিক ক্ষয় হয় না? তোমার মত কোন অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায়?... তোমার জীবনে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যেরূপ আমরা দেখিতে পাই, সেই রূপ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ জীব কি মানব জীবনের আদি অন্ত দেখিতেছে?'

এটুকু পড়লেই জগদীশচন্দ্রের 'ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে'র কোন কোন অংশের কথা মনে হয় যা 'দাসী' পত্রিকায় ১৮৯৫-তে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং 'অব্যক্ত' পুস্তকেব প্রথম সংস্করণে (১৯২১) অন্তর্ভূক্ত হয়। তুলনা করা যাক —

'একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীকৃত হইতে দেখিলাম।... যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি! যে যায় সে কোথা যায়?... কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, ''আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই! দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।''... শিব ও রূদ্রে! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।...'

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান' (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৯৬০) গ্রন্থে লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রকাশিত ... 'প্রাকৃতিক ইতিহাসের' (১৮৮৪) আলোচ্য বিষয় ভূগোল ও ভূবিদ্যা।' প্রমথনাথ সম্পর্কে তাঁর তথ্যসূত্র শশীভূষণের 'জীবনীকোষ (পঞ্চম খণ্ড)'। ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'ভূবিজ্ঞান বিষয়ক... আলোচ্য বিষয় ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ ও বায়ু। এখানে আলোচনা যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। তবে ভাষার আড়ষ্টতা প্রমথনাথের রচনার প্রধান ত্রুটি। প্রমথনাথ ছাড়া আধুনিক যুগে (অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে - সু. কু. সেন) আর দু একজন

মাত্র লেখক সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ভূবিজ্ঞান লিখেছেন।' প্রকাশের কয়েক মাস পবে (ভাদ্র, ১২৯২ সন; সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫) ভারতীতে 'প্রাকৃতিক ইতিহাসে'র যে একটি ছোট সমালোচনা বের হয় তাতে লেখা হয — 'এইখানি ভূবিদ্যা এবং প্রাকৃতিক ভূগোল বিষযক একটি পাঠ্য পুস্তক, এবং প্রচলিত প্রাকৃতিক ভূগোল সকল হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে লিখিত। বঙ্গদেশেব প্রাকৃতিক অবস্থাই ইহাব বিশেষ আলোচ্য বিষয। ইহাব প্রণালী যেমন সুন্দর — ভাষাও তেমনি সরল। কেবল বালক বলিযা নহে, অনেক বড় বালকে ইহা পড়িয়া সহজে প্রাকৃতিক রহস্যের সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করিতে পাবেন। পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকেব শিক্ষায় বিশেষ উপযোগী। ...

ভট্টাচার্যের মতে যার 'ভাষার আড়ষ্টতা ... প্রধান ত্রুটি', ভাবতীব সমালোচকেব মতে — 'ইহার .. ভাষাও তেমনি সরল।' প্রমথনাথ ছোটদের জন্য আরও একটি বই লিখেছিলেন — 'শিশুপাঠ'। 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' বা 'শিশুপাঠ' দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু তাঁর 'প্রবন্ধ সংগ্রহে'র প্রবন্ধগুলি পড়লে ভারতীর সমালোচকের মতই সমর্থনযোগ্য মনে হয়। এই বইয়ের প্রত্যেকটি রচনার ভাষা সাধু, মার্জিত, সাবলীল ও গতিশীল এবং সর্বোপরি অনুধেয়। তাঁব ভাষা ব্যবহার ও উপস্থাপনায় একটি স্বকীয়তার ছাপ আছে।

১৮৭১ সালে ষোল বছর বযসে প্রমথনাথের কবিতার বই 'অবকাশ কুসুম' বেব হয। বইটির একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনোরঞ্জন গুপ্তব 'আচার্য প্রমথনাথ' বইতে উদ্ধৃত হযেছে (বর্তমানে সংকলনের ২৫ পৃ. দ্র.)। এই পংক্তি কয়টির ভাষা ও ভঙ্গি ভারতচন্দ্র, গুপ্ত কবি এবং কতকাংশে মাইকেল অনুসারী। কিন্তু ভাব ও বক্তব্য ঊনবিংশ শতাব্দীয় এবং আধুনিক। অর্থাৎ যুবোপীয় ভাব ও বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাতের সংক্ষোভে প্রভাবিত। রচনাটি সনেট কীনা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত নয়। কিন্তু পয়ারের খাঁচায় সনেটের বাঁধুনী যা মাইকেল বা এমনকী ইয়ংবেঙ্গলদের কারও কারও রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বহুলক্ষিত তা এই কবিতাটিতেও ।

প্রমথনাথের গদ্যের যে নমুনা আমরা পাচ্ছি তার সবকটিই তাঁর বিলাত হতে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর - ত্রিশ-চল্লিশ বছব বযসে লেখা। প্রথম দিকের গদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বঙ্কিম অনুসারী। এই পর্যায়ের প্রথম 'কেঁচো'। ছোটদের পাঠ্যপুস্তকের ধরনে লেখা। কিন্তু কিশোর পাঠকের জন্য 'জনপ্রিয়' রচনা হিসেবেও গণ্য হতে পারে। রচনাটির সর্বাপেক্ষা বড় গুণ পাঠককে হাতে-কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে টেনে নেওয়া হচ্ছে। ভাষা সাবলীল ও ঋজু। আজকের দিনেও— এই একবিংশ শতাব্দীতেও এটি বিজ্ঞান-রচনার 'মডেল' হতে পারে। ঐ পর্যায়েই প্রমথনাথ তাঁর 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' লেখেন। সম্ভবত ঐ বিষয়ে প্রচলিত ছাত্র পাঠ্য

পুস্তকগুলির হীনতা বিশেষত বিজ্ঞান তথ্য ও বৈজ্ঞানিকতার ন্যূনতা তাঁকে ঐ কাজে প্রবোচিত করে। তদানীন্তন পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষা ও ভঙ্গি হতে প্রমথনাথের ভাষা ও ভঙ্গি উন্নত। বলা যেতে পারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ইয়ংবেঙ্গল, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয় দত্তদের যুগ-পার হয়ে বঙ্কিম যুগের লক্ষণাক্রান্ত হয়েও, অন্তত বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথ তাও কতকটা অতিক্রম করে গেছেন।

ফুলের প্রতি' একটি বৈজ্ঞানিক রচনা, কিন্তু কাব্যগুণ মন্ডিত। বঙ্কিমের 'খদ্যোৎ'বা 'বৃষ্টি'র মডেলে রচিত (দ্র. গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক; বঙ্কিম রচনাবলী)। আশ্চর্য নয়— এ লেখাটিকে ভারতীর বার্ষিক নির্ঘন্টে কবিতা বলে দেখানো হয়েছিল।

এটি স্পষ্ট যে প্রমথনাথ ছ বছর বিলাতে থাকলেও বাঙালীত্ব হারান নি। রমেশচন্দ্র দত্ত'র কন্যাকে বিবাহও সম্ভবত তাঁকে বাঙলা লেখায় উদ্বুদ্ধ করে থাকবে।

জিতেন্দ্রলাল বসু কৃত অনুবাদের দুটি নমুনার মধ্যে ('সভ্যতার স্তর ও যুগ' এবং 'সভ্য সমাজের ক্রমবিকাশ') প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি অনেক বেশী সরস। দ্বিতীয়টি তাঁর সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণ। প্রমথনাথ তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণের শুরুতে লিখেছেন — 'এই প্রবন্ধটির অধিকাংশ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু এম. এ., বি. এল. আমার "Epochs of Civilization" এর যে অনুবাদ করিতেছেন তাহা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুবাদের কিয়দংশ কোন কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।' স্বাভাবিক যে এই রচনাটির খশড়া অনুবাদের উপর তিনি স্বয়ং যথা কলম চালিয়েছিলেন।

'গোঁড়গীত' একটি অন্যরকম রচনা। গোনদ, গোণ্ড বা গোঁড় নামক আদিবাসী জনের বাস মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কতক অঞ্চলে নর্মদা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী এলাকায়। '...খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক হিসলশ গোঁড়দের কতকগুলি গীত সংগ্রহ করেন। ... ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে...রিচার্ড টেম্পল...ঐ সকল গীত ইংরাজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন'। প্রমথনাথ সেই গীতের অংশ-বিশেষ মিলহীন কবিতায় পয়ার ছন্দে অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করেন। রচনাটির ঢঙ ও ভাষা প্রচলিত পাঁচালী গানের মতোই।

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রমথনাথের প্রথম জীবনের রচনা— কী বাংলা, কী ইংরিজি — সেকুলার (secular) এবং যুক্তি বিন্যস্ত, কিন্তু পরবর্তী জীবনের রচনায় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ না থাকলেও কিন্তু আধ্যাত্মিকতা আছে।

১৮৯১ খৃঃ প্রমথনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সংঘবদ্ধ চর্চার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা একাডেমী প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তাঁর মতে ঐ প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান কাজ হওয়া উচিত— বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা (এ বিষয়ে বর্তমান সংকলনের 'বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা' প্রবন্ধের শেষ দুটি অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে — বাংলা ভাষাতেই জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য বিষয়ক

চর্চা পঠন পাঠন ও গবেষণার ব্যাপারে আবও অনেকেব মতো প্রমথনাথেরও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটে প্রাথমিক স্তরের টেকনিক্যাল বিষয়গুলি বা বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ বাংলা ভাষায় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক চর্চা বিশেষত, বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান, ভাষাতত্ত্ব, ভাযা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা, বাংলা ভাষাতেই বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশেব চেষ্টাব জন্য কোন এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা স্থাপনের চিন্তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত হয়েছিল এবং এবাবদে কিছু চেষ্টাও হয়েছিল। বাগলের বই থেকে মনে হয় এমন একটি প্রস্তাব প্রমথনাথই প্রথম উত্থাপন করেন এবং বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অব লিটারেচার বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগঠন প্রমথনাথের প্রস্তাবের পূর্তি। এটি ঠিক নয়। এই বিষয়টিব উল্লেখ মনোরঞ্জন গুপ্তর বইতে নেই।

মদন মোহন কুমার তাঁব 'বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ইতিহাস ঃ প্রথম পর্ব' পুস্তকে দেখিয়েছেন,— ১৮৭২-এ জন বীমস নামক একজন ইংরেজ আই.সি.এস. ইংরিজিতে একটি 'অনুষ্ঠান পত্র' বা 'প্যামফ্লেট' প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকায় তিনি একটি 'অ্যাকাডেমী অব লিটারেচার ফর বেঙ্গল' গঠনের প্রস্তাব দেন। ঐ প্রস্তাবের একটি বাংলা অনুবাদ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' এর দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ অনুষ্ঠান পত্র' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তিনি ইংলন্ডে থাকাকালীনই গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্তী কালে বহু বছর (১৮৬২-১৮৯৩) বঙ্গদেশে বাস করেন এবং বাংলা ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। বাঙলা ভাষার একটি ব্যাকরণ বইও প্রকাশ করেন। বীমসের বাংলা রচনাটি প্রকাশ করার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি মন্তব্যও জুড়ে দেন এবং আশা প্রকাশ করেন এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হবে। ১৮৮২'র মে মাস (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) ভারতী পত্রিকায় ''কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন'' নামে একটি প্রবন্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করেন। তার মাস দুয়েকের মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ''সারস্বত সমাজ'' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, নিয়মবিধি লেখা হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সহযোগী সভাপতি; কৃষ্ণবিহারী সেন (কেশবচন্দ্র সেনের ভাই) ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র (সম্ভবত বীমস প্রস্তাব মনে রেখে) এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'অ্যাকাডেমী অব বেঙ্গলী লিটারেচার' রাখতে চেয়েছিলেন, সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। 'সমাজের' আয়ু ছিল কয়েক মাস।

আরও এগার বছর পর ১৮৯৩ আরেক বাঙালি 'ইংরেজ' এল. লিওটার্ড-এর আগ্রহে ও চেষ্টায় 'দি বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অব লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত হয়। কারও মতে লিওটার্ড চন্দননগরবাসী 'ফরাসী' ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাসিক মুখপত্র প্রায় বছর

খানেক প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার কয়েকমাসের মধ্যেই 'অ্যাকাডেমী'র একটি বাংলা নাম— 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' সংযোজিত হয়। মুখপাত্রে ইংরিজি ও বাঙলা উভয় ভাষায়ই রচনাদি প্রকাশিত হত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা ছিলেন— লিওটার্ড, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি। কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে সভাপতি কবা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯ এপ্রিল ১৮৯৪ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ জন সুধী ব্যক্তিকে সদস্য করা হয়। লক্ষ কবাব বিষয় এঁদের মধ্যে ঠাকুববাড়ির কেউ ছিলেন না। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন, 'কঙ্কাবতী' লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তখন অসুস্থ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। ১৮৯৪-এর ২৯ এপ্রিলেই ইংরিজি নাম বাদ দিয়ে বাঙলা নামটিই বহাল রাখা হয় এবং অ্যাকাডেমী তথা পরিষদের আঠাশতম অধিবেশনে বিজয়কৃষ্ণ দেবেব প্রস্তাবে ১৩০১ বঙ্গাব্দের (১৮৯৪-৯৫) জন্য রমেশচন্দ্র দত্তকে পরিষদের সভাপতি করা হয়। লিওটার্ড ও প্রথম বছরের কার্যকরী সদস্যরা নূতন কার্যনির্বাহক সভায় সদস্য রইলেন। সহকারী সভাপতির পদে প্রথম অধিবেশনেই নবীনচন্দ্র সেনের নাম অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। অনেক আলোচনার পর তাঁকে দ্বিতীয় সহ-সভাপতি মনোনীত করা হয়। ভারতী পত্রিকায় পৌষ ১৩০০ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৮৯৩-৯৪) স্বর্ণকুমারী দেবী 'বাঙলা অ্যাকাডেমী' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রমথনাথও তার নিজের লেখায় বলেছেন — তাঁব প্রস্তাবটিও 'বোধহয় নূতন নহে'।

২৭ জুলাই ১৮৯৪ এর তৃতীয় অধিবেশনে সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাতাশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিষদের সভ্যরূপে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রমথনাথ বসুও। এত সমস্তের পরও, সাহিত্য পরিষদের কর্মচেষ্টার সঙ্গে প্রমথনাথকে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা দেখা গেল না। যিনি বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার দোষক্রুটি দেখাচ্ছেন ও সমাধান বাতলাচ্ছেন, পরিষদের পরিভাষা চেষ্টায় তিনি নেই। ১৯১৬তে তাঁকে বিজ্ঞান শাখা সভাপতি করাটাও যেন মনে হয় দায়সারা গোছের। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ প্রভৃতি সমসাময়িকরা এবং পরবর্তীরা কেউই তাঁর বাংলা ভাষার লেখক — কৃতিকে স্বীকৃতি দেননি। পরিষদের গৃহনির্মাণে তাঁর কন্যা 'লেডি প্রতিমা মিত্র'কে ডাকা হয়েছে — তাঁরই প্রয়াণ বৎসরে। সেখানে লেডি মিত্রের পরিচয় রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্রী, প্রমথনাথের কন্যা নয়। পরিষদে রক্ষিত শ'দেড়েক তৈলচিত্রের মধ্যে প্রমথনাথের ছবি নেই।

জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে পরিষদ সাম্মানিক সদস্য করে। বাংলা ভাষার বিজ্ঞানরচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথের অবদান এঁদের দু'জনের চেয়ে কম না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে করেনি! আশুতোষ প্রমথনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কাজে ডাকেননি! প্রমথনাথ বিটিআই ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যুক্ত ছিলেন বলেই কি? প্রমথনাথ কিন্তু প্রয়োজন স্থলে এঁদের কৃতির উল্লেখ করেছেন সাবলীলভাবে।